একক ৫ ☐ ছেঁড়া তার

পর্যায় ২ একক ৫

৫.১ নাট্যকার ঃ তুলসী লাহিড়ী

৫.২ নবনাট্য আন্দোলন

৫.৩ নাটকের কাহিনি বিন্যাস

৫.৪ নাটকের পরিপ্রেক্ষিত : গ্রাম বাংলা ও পঞ্চাশের মন্বন্তর

৫.৫ নাটকটির বর্গীকরণ

৫.৬ প্লট বিচার

৫.৭ নামকরণের তাৎপর্য

৫.৮ ট্র্যাজেডির উৎস ও পরিণতি : নেপথ্য পরিণাম

৫.৯ মুখ্য চরিত্রগুলির পর্যালোচনা : ক. রহিম; খ. হাকিমুদ্দী; গ. ফুলজান

৫.১০ গৌণ চরিত্রের পরিচয় : ক. মহিম; খ. কানা ফকির; গ. অন্যান্য

৫.১১ নাটকের প্রাসঙ্গিকতা ও সামগ্রিক মূল্যায়ন

৫.১২ এই নাটকের ভাষা, সংলাপ, গান

৫.১৩ বিস্তৃত প্রশ্ন

৫.১৪ অবিস্তৃত প্রশ্ন

৫.১৫ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

৫.১ নাট্যকার : তুলসী লাহিড়ী

নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী (১৮৯৭-১৯৫৯) ছিলেন বিগত শতাব্দীর চল্লিশের দশকে বাংলা নাটকের জগতের অন্যতম পুরোধা পুরুষ। বস্তুতপক্ষে, তাঁর 'ছেঁড়া তার', 'দুঃখীর ইমান' প্রভৃতি নাটকের মাধ্যমেই বাংলা নবনাট্য আন্দোলন উৎসারিত হয় বলে মনে করা যায়। প্রথম বয়সে তাঁর জন্মস্থান রংপুরে ওকালতি ব্যবসা শুরু করলেও, তাঁর বেশী আগ্রহ ছিল সংগীত সাধনায়। পরে কলকাতায় এসেও একই সঙ্গে আইন ও সংগীত দুয়েরই চর্চা অব্যাহত রাখেন তিনি। এরপরে অভিনয়ের জগতে তাঁর পদক্ষেপ ঘটে : বহুরূপী এবং রূপকার, এই দুই নাট্যগোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে মঞ্চে নিয়মিতভাবেই অভিনয় করেছেন তিনি। প্রায় পঞ্চাশটি চলচ্চিত্রেও অবতীর্ণ হয়েছিলেন তিনি।

তুলসী লাহিড়ী পনেরোটি একাংকিকা এবং তেরোটি পূর্ণাঙ্গ নাটক লিখেছিলেন, যাদের মধ্যে বেশ কয়েকটিই বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে স্থায়ী মর্যাদার আসন অধিকার করে রেখেছে। 'ছেঁড়া তার' সেই তালিকায় অবশ্যই প্রথম নাম। তাঁর অন্যান্য উল্লেখনীয় নাটকের মধ্যে আছে পূর্বোক্ত 'দুঃখীর ইমান' ছাড়াও, 'লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার', 'পথিক', 'বাংলার মাটি', 'নববর্ষ', 'নায়ক', 'গ্রীনরুম', 'ওলটপালট', মণিকাঞ্চন', 'চৌর্যানন্দ', 'দেবী' প্রভৃতি। নিজের সমকালের

অজস্র সমস্যা ও সামাজিক-নৈতিক স্খলনকে উপজীব্য করে তিনি এই যেসব নাটকগুলি রচনা করেছেন সেগুলির বাস্তবধর্মিতা অসামান্য। পঞ্চাশের মন্বন্তরের প্রেক্ষিতে লেখা 'ছেঁড়া তার' এবং 'দুঃখীর ইমান'—এ দুটি নাটককে তো কেউ-কেউ সমকালের (আর্থ-সামাজিক) ইতিহাসের বিশ্বস্ত দলিল হিসেবেই মনে করেন। দেশ ভাগের যন্ত্রণা ও সমস্যা ('বাংলার মাটি' এবং 'লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার'); শ্রমজীবী মানুষের জীবন সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন যুগের উদ্ভাসের প্রতীক্ষা ('পথিক'); ভণ্ড জননায়কের স্বার্থান্ধ স্বরূপের উদ্‌ঘাটন ('মণিকাঞ্চন'); দাঙ্গা-দুর্ভিক্ষ-দেশভাগ-কালোবাজারির চিহ্ননির্দেশী ভেজাল বস্তুর পণ্যায়নে মুনাফাবাজির চিত্রায়ন ('ওলট-পালট'), শ্রেণীসমাজের শোষণের লব্ধফল—নারীর অমর্যাদার মর্মন্তুদ রূপ চিত্রণ ('নববর্ষ') প্রভৃতি বিষয়কে তুলসী লাহিড়ী তাঁর এই সব নাটকের মুখ্য উপজীব্যরূপে গ্রহণ করেছেন।

তাঁর নাট্য সৃষ্টির মুখ্য প্রেরণা সমকালের সমাজের বহুবিচিত্র অপহ্নব হলেও, একটা কথা কিন্তু বিশেষভাবেই স্মরণযোগ্য : জীবনের দুঃখ, গ্লানি, বেদনা, অসহায়তা তিনি সুনিপুণভাবে চিত্রায়িত করেছেন বটে, কিন্তু তার বিরুদ্ধে অনমনীয় প্রতিজ্ঞায় রুখে দাঁড়ানোর ছবি সেখানে বিরলপ্রাপ্য; নেই বললেই চলে। অবশ্য গণনাট্যের ভাবাদর্শের সঙ্গে হয়ত এই কারণেই তুলসী লাহিড়ীদের বিচ্ছেদ ঘটেছিল। তা সত্ত্বেও, জীবনের নির্মম নিষ্পেষণের মধ্যেও মানুষ যে বাঁচার অভীপ্সা হারায় না, বা হারাতে চায় না—এমনটাই তাঁর নাটকে বারংবার ব্যঞ্জিত হয়েছে।

৫.২ নবনাট্য আন্দোলন

১৯৪৩ সালে গণনাট্য সঙ্ঘের প্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে স্বাধীনতা, সাংস্কৃতিক প্রগতি ও অর্থনৈতিক সুবিচারের জন্য জনগণের বক্তব্যের মঞ্চ ও সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে তারা কাজ করবে। পাশাপাশি ঐতিহ্যাশ্রিত শিল্পকলাকেও পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়াস চলবে। কিন্তু আন্দোলনভিত্তিক কর্মসূচী নিয়ে সংঘের সদস্যদের মধ্যে তীব্র মতভেদ, শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নে মতান্তর, রাজনীতি তথা পার্টি কতদূর শিল্পের ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব করবে—এইসব বিষয় নিয়ে মাত্র চার বছরের মধ্যেই গণনাট্যের মধ্যে ভাঙন দেখা দিল। ১৯৪৮ সালে একাংশ সদস্য বেরিয়ে গিয়ে তৈরী করলেন 'বহুরূপী' নাট্যদল—শম্ভু মিত্রের নেতৃত্বে। এইভাবে ধীরে ধীরে ক্রমাগত পঞ্চাশের দশকে গণনাট্য ভাঙতে শুরু করেছিল। ১৯৫৪ সালে খানিক সংশোধনের পর সঙ্ঘের দক্ষিণ কলকাতা শাখাটি আবারও কিছুদিন নাট্যচর্চা করছিল গণনাট্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই। কিন্তু তাতেও ভাঙন রোধ করা গেল না। 'বহুরূপী' ছাড়াও আরো বহু নাট্যদল তৈরি হল—গণনাট্য নয় নবনাট্যের ভাবনায় শরিক হয়েই। এইভাবে প্রথাগত নাট্যভাবনাকে অবিন্যস্ত চেহারা থেকে নতুন করে সঞ্জীবিত করতেই নবনাট্যের সূচনা—এমনটাই দাবী করেন এর মুখ্য প্রবক্তা শম্ভু মিত্র প্রমুখ। মূলত রাজনৈতিক ভাবনার সহায়ক হিসেবে নাট্য তথা শিল্পচর্চাকে তাঁরা শিল্পের অপমান মনে করেন। এই প্রেক্ষিতেই তাঁদের উপলব্ধিতে গণনাট্যের পদ্ধতিকে সীমাবদ্ধ বলে মনে হতে থাকে। এই মতাদর্শগত বিরোধই নবনাট্যের প্রেরণা হয়ে ওঠে। এইভাবে সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মে 'স্বাধীনতার' বিষয়টি প্রধান হয়ে উঠতে থাকে—এইভাবেই তৈরি হল ব্যক্তিকেন্দ্রিক দল গঠনের পারিপার্শ্বিক। 'সংকীর্ণতা মুক্তি'-র চিন্তা থেকেই পঞ্চাশের দশকে সম্ভবত শম্ভু মিত্রই 'নবনাট্য আন্দোলন' শব্দগুচ্ছটি ব্যবহার করেন। নবনাট্য আন্দোলনের নাটকে তাঁরা একই সঙ্গে দেখাতে চান সমাজের রূপ ও সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিমানুষের জীবনের সুখদুঃখ, সেন্টিমেন্টের রূপও। ব্যক্তি ও সমষ্টিকে একই সঙ্গে নাটকের ফর্মের মধ্যে দেখাতে হলে, প্রকাশভঙ্গী বদলাতে হয়—তাই নবনাট্যের প্রকাশভঙ্গীও হলো আলাদা—যার পূর্ণাঙ্গ রূপ দেখা গেল "রক্তকরবী" নাটকেও যা গণনাট্যের 'জবানবন্দী' কি 'নবান্ন' থেকে আলাদা। এই স্বতন্ত্র প্রকাশভঙ্গীও নবনাট্যকে গণনাট্য থেকে পৃথক করে দিল। তাছাড়া মানুষের ব্যক্তিগত অনুভূতির আরো কাছাকাছি আসার প্রয়াসের জন্য নবনাট্য ক্রমেই বেছে নিতে লাগল মনস্তত্ত্বমূলক কি ব্যক্তিকেন্দ্রিক নাটকের প্রযোজনা। এই সূত্রেই মঞ্চায়িত হল "ছেঁড়া তার" নাটক যা সমষ্টির পাশে ব্যক্তি প্রাধান্য ও মনস্তত্ত্বমূলকতাকে প্রতিফলিত করেছে।

৫.৩ নাটকের কাহিনি বিন্যাস

বাল্যকালের সহপাঠী এবং সরকারি অফিসার মহিমের শহরের বাড়িতে এসে পরম সমাদর পেল স্বল্পবিত্ত কৃষক রহিম। পুরানো দিনের প্রীতিময় স্মৃতিতে মহিম রহিমকে তার সঙ্গীতচর্চার জন্য কিনে দেয় একটা দিলরুবা আর তার বউ-ছেলের জন্য উপহার দেয় নতুন শাড়ি-জামা। (১ম অঙ্ক/১ম দৃশ্য)

বিশ্বযুদ্ধের কালো ছায়া উত্তরবঙ্গের অজ্‌গাঁয়েও এসে পড়েছে। গাঁয়ের মাতব্বর সুদখোর-মহাজন এবং কুচক্রী হাকিমুদ্দী গরিব চাষিদের কাছ থেকেও যুদ্ধের বাবদে সরকারি চাঁদা আদায় করছে—তারা সেটা মকুব করার আর্জি নিয়ে এসেছে তার কাছে। এমন সময়ে, হাকিমের গোয়ালের দড়ি-ছেঁড়া গরু রহিমের বাড়িতে ধান খাওয়ায় সেটাকে সে খোঁয়াড়ে দিয়েছে এই খবর এল। এর ফলে হাকিমে-রহিমে কথা কাটাকাটি হলে, রহিমকে শাসায় হাকিম। (১/২)

রহিম এবং ফুলজান বসে প্রাণের, মনের কথা বলে। শহর, সেখানকার মানুষজন, রীতিনীতির কথা রহিম স্ত্রীকে শোনায়। স্বামীর আনা জুতো জোড়া পায়ে দিয়ে হাঁটতে লজ্জা পায় ফুলজান। গোবিন্দ এসে খবর দেয়, শয়তান হাকিমুদ্দী রহিমের নামে সার্কেল অফিসারের কাছে চুক্‌লি কেটে তার নামে মিথ্যে অভিযোগ করেছে। গত রাতে একটা চুরির ব্যাপারেও হাকিমুদ্দী রহিমের নামে দোষারোপ করে দারোগার কাছে। কানা ফকির, হাকিমুদ্দীর ভৃত্য কুকরা মিথ্যে সাক্ষী দিলেও শেষ অবধি প্রমাণিত হয় রহিম নির্দোষ। রহিম আর হাকিমুদ্দীর মধ্যে শত্রুতার মাত্রা বাড়ে এই ঘটনায়। (১/৩)

দেশে আকাল। হাকিমুদ্দীর মতো শোষক, শয়তানদের অবশ্য তাতে কিছু ক্ষতি হয় না। তার বাড়িতে প্রাচুর্য এবং স্বাচ্ছল্যের ছাপ সর্বত্র। দুই অনুগত ভৃত্যোপম ব্যক্তির সঙ্গে হাকিম ষড়যন্ত্র করে কিভাবে অধিকাংশ ধান সরিয়ে ফেলে, দুর্ভিক্ষের জ্বালায় উদ্ভ্রান্ত গাঁয়ের লোককে উস্‌কিয়ে দিয়ে তার বাড়িতে লোক-দেখানি ধানের গোলা লুটতরাজের ব্যাপার ঘটানো যায়! ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টও তার ঐ হীন চক্রান্তের অংশীদার হয়। (২/১)

দুর্ভিক্ষ আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। হাকিমুদ্দীর দুই পরিচারক কুদরৎ এবং সহরুল্লা লোক-দেখানি গোলা লুটের কথা আলোচনা করে। গোবিন্দ, মামুদ, শ্রীকান্ত, তমিজ প্রমুখ গ্রামবাসীরা নিজেদের দুর্দশার কথা বলাবলি করে। রহিমের মায়ের মৃত্যু, তার নিজের কঠিন রোগ ভোগ ইত্যাদির কথাও প্রসঙ্গক্রমে ওঠে। অথচ গ্রামের প্রায় সব মানুষই নির্ভর করতে চায় তারই বিচারবুদ্ধি, পরামর্শের উপর।

রহিম এসে এই চরম দুঃসময়েও সকলকে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে বলে। যেখানে দুর্ভিক্ষের ফলে মানুষ না খেয়ে দলে দলে মরছে, অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে রোগে ভুগে মরছে, খিদের জ্বালায় ঘটি বাটি তো বটেই, এমনকি স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকেও বেচে দিচ্ছে, গ্রাম ছেড়ে শহর কলকাতার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিচ্ছে, সেখানে ধানের গোলা লুট করার কথা চিন্তা করা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু লুটতরাজে যে কোনও সমাধান হয় না—রহিম সেটাই সবাইকে বোঝায়। রহিম আরও বলে যে, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গিয়ে সবাই মিলে আর্জি করা হোক সরকারি লঙ্গরখানা খোলার জন্যে। আড়ি পেতে সহরুল্লা এই কথা শুনে, তার মনিবকে গিয়ে জানায়। হাকিমুদ্দী আর প্রেসিডেন্ট আবারও ষড়যন্ত্র করে, তারাই এই পরিকল্পনাটা আগে দেবে সরকারকে—তাতে তাদের চোরা পথে আয় এবং সামাজিক প্রতাপ আরও বাড়বে যেহেতু! (২/২)

বসির আর ফুলজানকে রহিম রেখে এসেছে এক আত্মীয়ের বাড়িতে। দুশ্চিন্তায়, অভাবে, অনটনে অবসন্ন বসির দিলরুবাটা নিয়ে একটু বাজায়। শ্রীমন্তকে বলে হাকিমুদ্দীর বাড়িতে যে সরকারি লঙ্গরখানা বসানো হয়েছে, সেখানে আত্মসম্মান খুইয়ে সে খেতে যায়নি। মাসির বাড়িতে গঞ্জনা শুনে ফুলজান বসিরকে নিয়ে ফিরে আসে। রহিমের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও, অসহায় ফুলজান ক্ষুধার্ত ছেলেকে লঙ্গরখানায় খাওয়াতে নিয়ে যায়, কিন্তু যেহেতু রহিম চৌকিদারি ট্যাক্স দেয় (অর্থাৎ, নিষ্প্রাণ সরকারি আইনের চোখে স্বচ্ছল মানুষ!), তাই তার ছেলে-বউ সেখানে খেতে পাবে না—এই যুক্তি

দেখিয়ে হাকিমুদ্দী তাদেরকে তাড়িয়ে দেয়। ক্রোধে আত্মহারা হয়ে রহিম আচম্বিতে এক তালাকনামা লিখে ফেলে—ফলে শরিয়তি বিধানমতে ফুলজানের সঙ্গে তার বিয়েটা তৎক্ষণাৎ ভেঙে যায়! ফুলজান এখন আর 'ট্যাক্স-দেওয়া' রহিমের বউ নয়, তাই এবার থেকে আর লঙ্গরখানার লপ্‌সি পেতে তার আর কোনও বাধা থাকবে না! কিন্তু বসির যেহেতু সরকারি-বিচারে 'স্বচ্ছল' রহিমের সন্তান, তাই তার সেটা জুটবে না যেহেতু, তাই তাকে নিয়ে রহিম পাড়ি দেয় শহরের উদ্দেশে। হতবাক বেদনায় ফুলজান পড়ে থাকে একা, অসহায় হয়ে। (২/৩)

মহিমের বাড়িতে ঠাঁই পেয়েছে রহিম আর বসির। সামান্য একটা চাকরিও করে দিয়েছে মহিম। বসির কিন্তু গুরুতর অসুস্থ; মাকে ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়ে হেদিয়ে মরছে সে। দেশে গিয়ে ফুলজানের সঙ্গে দেখা করা এবং বসিরকে তার কাছে রেখে আসার পরামর্শ দেয় মহিম রহিমকে। কিন্তু রহিম তা মানতে চায় না, কারণ প্রথমটায় হাদিসের বিধানকে অমান্য করা হবে, আর দ্বিতীয়টায় বসির "বাঁদির বাচ্চা" হয়ে যাবে (যেহেতু, নিরুপায় হয়ে ফুলজান এখন হাকিমুদ্দীর বাড়িতে দাসীর কাজ করছে জীবনধারণের জন্য)! রহিমের ধর্মানুগত্য এবং আত্মাভিমান তাকে মানসিকভাবে নিদারুণ বিপন্নতার মধ্যে ঠেলে দেয়। (৩/১)

গ্রামের পথে সরেমামুদ আর গোবিন্দর দেখা। কলকাতায় গান গেয়ে, ভিক্ষা করে গোবিন্দ কোনও মতে প্রাণে বেঁচেছে। মহানগরীর পথে ভুখমিছিলের করুণ, নির্মম বিবরণ দেয় সে। তার মুখেই শোনা যায় রহিমও ফিরে আসছে গাঁয়ে—তার "ভুলের মাশুল" চোকাতে। (৩/২)

নাটকের চূড়ান্ত দৃশ্যে অজস্র ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত দেখা যায়: হাদিসের বিধানমতে রহিম ফুলজানকে যাতে 'ধর্মত' ফিরে পাওয়া যায়, তার ব্যবস্থা করেছে। টাকা নিয়ে কানা ফকির ফুলজানকে নিকাহ্ করবে, তারপরে তাকে তালাক দেবে। নির্দিষ্ট একটা সময়ের পর, রহিমের সঙ্গে ফুলজানের আবার নতুন করে বিয়ে হতে পারবে তার সূত্রে। এদিকে বসির আরও অসুস্থ হয়ে পড়ে, ফুলজানও উতলা হয় প্রবলভাবে। আবার কানা ফকির ফুলজানকে নিকাহ্ করার জন্য আরও বেশি টাকা চায়। হাকিমুদ্দী এসে বাগড়া দেয়—হাকিমে-ফকিরে বাধে কুৎসিৎ ঝগড়া: ফুলজান সম্পর্কে দুজনেরই লোলুপতা অনাবৃত হয়ে পড়ে। ক্ষিপ্ত হয়ে রহিম ফকিরকে তাড়িয়ে দেয়, হাকিমুদ্দীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বিক্ষুব্ধ গ্রামের মানুষেরা। ফুলজানকে জোর করে নিয়ে আসে রহিম তাদের মুমূর্ষু ছেলের পাশে। ধর্মের সংস্কার আর মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতা—দুয়ের দ্বন্দ্বে উদ্ভ্রান্ত ফুলজানকে আশ্বস্ত করে রহিম: সে তাদেরকে 'ছেড়ে' চলে যাবে। উত্তেজনার বশে দিলরুবাটার তার ছিঁড়ে ফেলে রহিম—তারপর ঘরের দোর বন্ধ করে দেয়।

পাড়ার লোক এসে দরজা ভেঙে তার মৃতদেহটা বার করে আনে। গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে সে। ফুলজান করুণ বিলাপে আছড়ে পড়ে তার বুকের ওপর; হাদিসের বিধান তখন হারিয়ে গেছে। (অভিনয়কালে, অনেক সময়েই রহিমের আত্মহত্যার বদলে ফুলজানের মৃত্যুও দেখানো হয়েছে তুলসীবাবুর অনুমোদনক্রমেই।)

□

এই নাটকের কাহিনি বিন্যাসে দেখা যায় যে, দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে (তালাকনামা লিখে দেওয়া) এর গতি চূড়ান্ত শীর্ষে (অর্থাৎ, ক্লাইম্যাক্স-এ) পৌঁছেছে এবং তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে (রহিমের আত্মহত্যা) এর ট্র্যাজিক পরিণাম (অর্থাৎ, ক্যাটাস্ট্রোফি) উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। সামগ্রিকভাবে দেশ ও জাতির চরম এক বিপর্যয়ের প্রেক্ষিতে, তারই অবশ্যম্ভাবী অনুষঙ্গে একটি পরিবারেরও বিধ্বংসী সর্বনাশ ঘটল। নাটকের প্রধান খলচরিত্র—যে মূলত এটার জন্য দায়ী—ক্ষিপ্ত জনতার হাতে লাঞ্ছিত হলেও কিন্তু ঐ অসহায় ট্র্যাজিক পরিণতির বেদনার উপশম কিন্তু ঘটে না যে তার ফলে, প্রসঙ্গক্রমে তাও স্মরণযোগ্য।

৫.৪ নাটকের পরিপ্রেক্ষিত : গ্রামবাংলা ও পঞ্চাশের মন্বন্তর

পঞ্চাশের মন্বন্তর নিয়ে লেখা বাংলা নাটকগুলির মধ্যে বিজন ভট্টাচার্যের "নবান্নে"-র পরে সম্ভবত তুলসী লাহিড়ীর "ছেঁড়া তার"-ই সবচেয়ে বেশি পরিচিত। "বহুরূপী"-র মতো বিশিষ্ট নাট্যগোষ্ঠী অনেকবার এই নাটকটি মঞ্চস্থ করেছেন বলেই এর পরিচিতি—শুধু তা নয়—এতে এমন কিছু সুগভীর ও মর্মস্পর্শী মানবিক আবেদন আছে, যা এর জনপ্রিয়তার উৎস স্বরূপ।

বিজন ভট্টাচার্যের 'আগুন', 'জবানবন্দী' (১৯৪৩), 'নবান্ন' (১৯৪৪), দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দীপশিখা' এবং তুলসী লাহিড়ীর "দুঃখীর ইমান" (১৯৪৭) ও "ছেঁড়া তার" (১৯৫০)—মন্বন্তর ও দুর্ভিক্ষ নিয়ে লেখা এই কটি বাংলা নাটকের মধ্যে একদিকে "নবান্ন", অন্যদিকে "ছেঁড়া তার"—নাটক দুটির বিশেষ মূল্য আছে।

"নবান্নে"-র মধ্যে দুর্ভিক্ষের যে সামগ্রিক রূপটি চিত্রিত হয়েছে, সে বিষয়ে শম্ভু মিত্র মন্তব্য করেছিলেন "নবান্নের আগে সব ট্র্যাজেডিই ডোমেস্টিক ট্র্যাজেডি। 'নবান্ন'-এ এল এপিক নাটকের ব্যাপ্তি।" ["নবান্ন" ; দ্বিতীয় প্রমা সংস্করণ ; পৃ : ১৯]—এই এপিক-ব্যাপ্তির কারণটি খুব সুষ্ঠুভাবে বুঝিয়েছিলেন কবি বিষ্ণু দে ঃ "নবান্ন আমাদের ইতিহাসের কয়েকটি মুহূর্ত আধৃত করেছিল নাটকের ভাষায় নাট্যরূপে.....সেই বেদনাকম্প্র জীবনের সঙ্গে একান্ত অভিনয়ের কর্তৃত্বে ও আবেগে।" ['বহুরূপী' পত্রিকা ; ৩৪ সংখ্যা ; পৃ : ৮৯]—আর এই দুজনের বক্তব্যের স্বরূপটুকু স্বয়ং নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য বলেছিলেন এইভাবে—"আমরা চেয়েছিলাম মজুতদার ও কালোবাজারীদের বিরুদ্ধে একটা জাগরণ ঘটুক।" ['নবান্ন' ; প্রমা—সংস্করণ ; পৃ : ১৯]

"নবান্ন" সম্পর্কে এতখানি আলোচনার কারণ এই যে, অত্যন্ত জনপ্রিয় ও মর্মস্পর্শী ও একই বিষয় নিয়ে লেখা হওয়া সত্ত্বেও ; "ছেঁড়া তার" এই নাটকটির মতো প্রতিরোধের প্রতিজ্ঞা নিয়ে ইতিহাসের সঙ্গে জীবনকে মিলিয়ে এপিক গড়ার পথে সহযাত্রী হয়নি।

উত্তরবঙ্গের রঙপুরের অঞ্চলের পটভূমিকায় পঞ্চাশের মন্বন্তরে বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়া বিশেষ একটি পরিবারের ট্র্যাজেডিই এর মধ্যে সর্বময় হয়ে থেকেছে। মন্বন্তর ও দুর্ভিক্ষ এখানে নিঃসন্দেহে ক্রিয়াশীল থেকেছে অপহ্নবী ঘটনা হিসেবে। কিন্তু সেসব কিছু ছাপিয়ে উঠেছে প্রথমে বিত্তবান ও ক্ষমতাশালী সমাজপতির উৎপীড়ন এবং তারপর ধর্মীয় সংস্কারাচ্ছন্নতা।

এ কথা ঠিকই যে নাটকের শেষে নিপীড়িত, অর্ধভুক্ত, দরিদ্র গ্রামের মানুষ ফুঁসে ওঠে এবং উৎপীড়ক সমাজপতি হাকিমুদ্দীকে সায়েস্তা করে। কিন্তু তবু এ নাটকে "নবান্নে"-র মতো বড়ো প্রতিরোধের ক্যান্‌ভাস প্রাপ্য নয়। কারণ "নবান্ন" নাটকে যে ক্ষয়ক্ষতি দেখানো হয়েছে, তা শুধু আমিনপুরের প্রধানের পরিবারের মানুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়—সমগ্র দেশের কয়েক কোটি নিরন্ন ও ক্ষুধার্ত মানুষের প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে এ নাটকের কুশীলবরা—আর প্রতিরোধের পথ বেয়ে সংগ্রামী মানুষদের যে লড়াই তা-ই এ নাটকের শেষ দৃশ্যে পূর্ণতা পেয়েছে বিপর্যয়কে অতিক্রম করে আসন্ন উজ্জ্বল দিনের প্রত্যাশায় পালিত উৎসবকে কেন্দ্র করে।

এই আশাবাদ "ছেঁড়া তার" নাটকে মেলে না—কারণ তার প্রেরণা ও অভিব্যক্তি সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর। তাই এতে ধরা পড়ে না কিভাবে দুর্ভিক্ষের ভয়াল বীভৎস মূর্তিটি সমস্ত দেশের সাধারণ মানুষকে মুখব্যাদান করে গ্রাস করতে আসছে। তাই এই সূত্রেই গ্রামবাংলায় দুর্ভিক্ষের পরিপ্রেক্ষিতে লেখা হলেও "ছেঁড়া তার" নাটকের বর্গটি আলাদা নিঃসন্দেহে।

৫.৫ নাটকটির বর্গীকরণ

আপাতভাবে দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় এ নাটকটি লেখা হলেও, প্রকৃতপক্ষে ফুলজানকে তালাক দেওয়া ছাড়া প্রত্যক্ষভাবে এই নাটকের আর কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ওপরই এর অভিঘাত সরাসরি পড়েনি। হাকিমুদ্দীর সঙ্গে রহিমের দ্বন্দ্বের সূত্রপাত মন্বন্তরের অনেক আগেই, রহিমের প্রতিবাদী মানসিকতার কারণে। এই ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের সূত্রেই লঙ্গরখানা থেকে বিতাড়িত হতে হয়েছিল ফুলজান ও তার ছেলেকে এবং এই অপমানে উদ্ভ্রান্ত হয়েই রহিম তালাক দিয়ে বসে স্ত্রীকে। অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের পাশাপাশি ক্ষমতাবান ধনীর শত্রুতাও কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না এই তালাকের নেপথ্যে। তাই 'নবান্নে'-র মতো এপিক-ব্যাপ্তি দূরে থাক, এমনকি পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যেও দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস সর্বময় হয়ে থেকে সর্বনাশ ঘটিয়েছে—এমনটিও বলা যাচ্ছে না।

বরং বলা যেতে পারে এই নাটকে সূক্ষ্ম জীবনবোধ ও শিল্পরস কাহিনীকে নিটোল এক বুনোটে বেঁধে নাটকীয় ধারাবাহিকতায় এগিয়ে নিয়ে গেছে ট্র্যাজিক পরিণামের দিকে। প্রকৃতপক্ষে রহিমের ফুলজানকে তালাক দেওয়ার মুহূর্ত থেকেই নাটকের ট্র্যাজেডি তরান্বিত হতে শুরু করেছে।

এই তালাক কিন্তু রহিম ও ফুলজানের ব্যক্তিগত কোনো বোঝাপড়ার অভাবে ঘটেনি। আসলে রহিমের মতো সাধারণ নিপীড়িত মানুষেরা এমনই একটা সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে থাকতে বাধ্য হয়; যেখানে অনাহার থেকে বাঁচবার তাগিদে নিজের স্ত্রী পুত্রকন্যাকেও কখনো বিক্রী করতে কিংবা ঘরের মেয়ে-বউকে পাপের পথে ঠেলে দিতে তারা বাধ্য হয় দুটো ভাতের জোগাড় করতে।—এই অতি পরিচিত ছকটি বদলে তুলসী লাহিড়ী "ছেঁড়া তার" নাটকে তালাকের বিষয়টি এনেছেন—যার অন্যতম কারণ রহিমুদ্দীর আত্মসম্মানবোধ ও স্ত্রীপুত্রের প্রতি অসীম ভালোবাসা। ফলে এ নাটকে তালাক নিছক একটি প্রচলিত বিবাহবিচ্ছেদ নয়—রহিম এ তালাক দিয়েছে প্রকৃতপক্ষ নিজের সুখ এবং প্রত্যয়কেই—ফুলজান যার প্রতীক তার জীবনে।

কিন্তু নাটকটির দুর্বলতা এখানেই যে অভাবিত পূর্ব বিক্ষিপ্ত ঘটনা—যা ট্র্যাজেডিকে অনিবার্য করে তুলল নাটকের পরিণামে—সেই ঘটনার বেদনা ও যন্ত্রণাকে ভাগ করে নেবার মতো কাউকে পাশে পেল না রহিম। কেন না ঠিক এই ধরনের অভিজ্ঞতাটি তার কোনো পড়শি বা বন্ধুর কাছে ছিল অজ্ঞাত। অথচ রহিমের প্রতি তাদের সহানুভূতি ও সমবেদনার কোনো খাম্‌তি ছিল না। তবু 'নবান্ন' নাটকে যেভাবে প্রধানের পরিবারের প্রতিটি মানুষের ক্ষেত্রেই নিজস্ব দুঃখগুলো আসলে বহুজনীন দুঃখের প্রতিনিধিকল্প হয়ে উঠেছিল; 'ছেঁড়া তার' নাটকে রহিম-ফুলজানের মর্মান্তিক পরিণতির ক্ষেত্রে তেমনটি হলো না—এটি একান্তভাবেই তাদের ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডিই হয়ে থাকল।

আসলে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে তবেই তার দুমুঠো ভিক্ষান্নের ব্যবস্থা করে দেওয়ার এই যে অভাবনীয় ও নির্মম পরিস্থিতি—এটি সূচিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই যদি রহিম সমব্যথী বন্ধুরা কি পড়শিরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে হাকিমুদ্দীর লঙ্গরখানায় চড়াও হত তাহলে এ নাটককেও প্রতিরোধের নাটক হিসেবে নিঃসন্দেহে গণ্য করা যেত। কিন্তু তা হয়নি। পক্ষান্তরে রহিম তালাকের সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্য হয়ে ওঠা ধর্মীয় সংস্কারকে পরাভূত করতে না পেরে আত্মহত্যা করে নিজের গ্লানি ও ব্যর্থতার জ্বালা মিটিয়েছে। একথা ঠিকই যে হাকিমুদ্দী তার বন্ধুদের হাতে অবশেষে নিগৃহীত হয়েছে—কিন্তু তাতে করে যে সমাজ ব্যবস্থার শিকার রহিমের মতো মানুষগুলো—তার কোনো পরিবর্তন কিংবা বদলের প্রত্যাশাও সূচিত হলো না; যেমনটি হয়েছিল "নবান্ন" নাটকে। তাই এই নিগ্রহ একান্তভাবেই ব্যক্তি হাকিমুদ্দীর প্রতি রহিমের বন্ধুদের ব্যক্তিগত রোষ।

অবশ্য এ নাটকের প্রথম থেকেই বুঝতে পারা যায় যে এর কুশীলবেরা প্রতিকূল বাস্তবতার সম্মুখীন হতে পারবে না। যে সংঘবদ্ধ প্রত্যাঘাতের শিক্ষা "নবান্ন"-এর আমিনপুরের মানুষগুলো ইতিহাসের কাছ থেকে পেয়েছিল, সেই তালিম

সমকালের হলেও "ছেঁড়া তার"-এর রহিমরা পায়নি। তাই দিনের পর দিন অভুক্ত থাকলেও তারা মজুতদার-মহাজনদের ধান লুঠ করার কথা চিন্তাও করতে পারেনি, কারণ তাদের বিচারে "মান" আর "হুঁশ" থাকলে মানুষ "লুঠ দাঙ্গা কইরবার যায় না।" [দ্বিতীয় অঙ্ক/দ্বিতীয় দৃশ্য]। কারণ তারা এও মনে করে "একদিনের লুটে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন প্যাট চলে না.....মাইর দাঙ্গাত খুনজখম হয়া কি ধরা পড়িয়া আপনজনগুলীক্ হেলি গেইলে তারাও ভাসি যায়।" [ঐ]—তাই অনেকেই মনে করে যে সরকার যখন ধান 'সীজ' করে নিয়েছে, তখন তার কাছেই ধান দাবী করা যেতে পারে—এবং সেও কর্জ হিসেবে।

আসলে এ নাটকে মূল রাজনৈতিক ও সামাজিক দ্বন্দ্ব যদি তীব্র হয়ে উঠতো, তাহলে নাটকের পরিণামে রহিম ও ফুলজানের সম্পর্কের বিষয়টি এত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারত না। কিন্তু এই বিষয়টিই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠায়, রহিমকে আত্মহত্যার পথে ঠেলে দিয়ে তবেই নাটকটি শেষ করা গেছে। এমনকি 'বহুরূপী'-র কিছু প্রযোজনায় রহিমের বদলে ফুলজানের মৃত্যুর মাধ্যমেও নাটকের সমাপ্তি টেনেছেন নাট্যকার। যেই হোক—মূল কুশীলবের মৃত্যু ছাড়া নাটকের সমাপ্তির অন্য কোনো বিকল্প খাড়া করা যায়নি। অর্থাৎ সবকিছু ছাপিয়ে রহিম ও ফুলজানের ব্যক্তিগত বিপর্যয়টাই এ নাটকে প্রধান হয়ে উঠল। এবং বিত্তবানের উৎপীড়ন, অন্নাভাব ও ধর্মীয় সংস্কার—এই তিনের মিলিত আক্রমণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে গেল—পাঠক-দর্শক মনে এমন একটি বোধ সঞ্চারিত করেই এ নাটক শেষ হয়। আর ঠিক সে কারণেই "ছেঁড়া তার" কখনোই প্রতিরোধের নাটক হয়ে উঠল না, শেষ দৃশ্যে জনতার হাতে হাকিমুদ্দীর নিগ্রহ সত্ত্বেও।

নাটক জুড়ে তাই প্রতিবাদ-প্রতিরোধের পরিবর্তে বহমান হয়ে থেকেছে বেদনার মর্মস্পর্শিতা—জীবনবীণার তার ছিঁড়ে যাওয়ার করুণ মূর্চ্ছনা—তাই অত্যাচারের পীড়ন মানুষগুলোকে কাঁদায়, রাগায় কিন্তু প্রতিবাদে উদ্বুদ্ধ করে না। আর তাদের সেই বেদনায় সমব্যথী হয় দর্শকেরা।

যে মন্বন্তরের সুবাদে শুধু কলকাতার রাজপথেই পঞ্চাশ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল, সেই ভয়ংকর মারণোৎসবের প্রতীকী ব্যঞ্জনাও তাই রহিম/কিংবা ফুলজানের মৃত্যুর প্রতীকে ফুটে ওঠে না। সমকালের স্বদেশের বৃহত্তম বিপর্যয় এ নাটকে তাই একটি অস্পষ্ট প্রেক্ষাপট হয়েই রইল। দুর্ভিক্ষ একটি চরিত্র হয়ে কাহিনীর মধ্যে অলক্ষ্যে থাকলেও তা অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠতে পারল না। ক্ষমতাশালী শত্রু ও ধর্মীয় কুসংস্কার—যা সাধারণ মানুষের সর্বকালের সর্বদেশের বৈরী—তারাই এখানেও মুখ্য হয়ে থাকল। সমকালের ভয়ালতম অপহ্নবের দলিলচিত্র হবার পরিবর্তে "ছেঁড়া তার" একান্তভাবেই ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি নির্ভর একটি নাটকে পর্যবসিত হলো।

৫.৬ প্লট বিচার

প্রথম দৃশ্যের তাৎপর্য/শেষ দৃশ্যের দুটি পৃথক রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা

"ছেঁড়া তার" নাটকটিকে তুলসী লাহিড়ী কোনো সময়েই সংগ্রামের ইস্তেহার করে তুলতে আকাঙ্ক্ষী ছিলেন না। একটা সময়ে দুর্ভিক্ষকে প্রেক্ষিতে রেখে বাংলার হতভাগ্য কৃষকের জীবনকে নিয়ে অজস্র উপন্যাস, গল্প, কবিতা এবং নাটক আমাদের সাহিত্যে রচিত হয়েছে। এই বর্গের লেখাগুলির মূল তিনটি ধারা দেখা যায় :

(ক) যা ঘটেছে তার শিল্পসম্মত এবং করুণ রসের দলিল তৈরি করা।

(খ) এই আকালের পিছনে মানুষের যে লোভ ও কুটিলতা ক্রিয়াশীল থাকে, সেটিকে ফুটিয়ে তোলা।

(গ) আকালকে উপলক্ষ করে প্রতিবাদী মানুষের প্রতিরোধ ও ভবিষ্যতের উজ্জ্বল দিনের প্রত্যাশা করা।

"ছেঁড়া তার" নাটকে প্রথম দুটি ধারার একটি মিশ্রিত রূপ প্রকাশিত হয়েছে। তাই প্রথম থেকেই এ নাটকের মধ্যে

তুলসীবাবু এমন কোনো ইঙ্গিত রাখেননি, যার পরিণতিতে রুখে দাঁড়ানোর বা বিপর্যয় অতিক্রম করার আকাঙ্ক্ষার ছবি ফুটে উঠতে পারে। বরং তিনি বেশী আগ্রহী ছিলেন রহিমের ব্যক্তিগত জীবনের সুখদুঃখের ছবি আঁকতেই। এবং তারই সূত্রে দেশকালের বৃহত্তর পরিবেশটির সামান্য খানিকটা আভাস মিলেছে। সম্ভবত এই কাহিনির পরিণাম আগেই স্থির করে সেই অনুযায়ী নাট্যকার প্লটটিকে ধীরে ধীরে বুনেছেন।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে নাটকের প্রথম দৃশ্যে তাৎপর্যপূর্ণ দুটি ঘটনার বিন্যাস করেছেন তুলসীবাবু। এই দৃশ্যেই মহিম রহিমকে উপহার দেয় একটি দিলরুবা। শেষ দৃশ্যে এই দিলরুবার তার ছিঁড়ে যাবার মাধ্যমেই যে নাটকের ট্র্যাজিক যবনিকাপতন ঘটবে; তার একটি পূর্ব-সঙ্কেত সূচিত হয়ে যায় নাটকের গোড়ায় এই প্রথম দৃশ্যেই। আরেকটি ঘটনায় রহিমের শখের ফুলগাছটি হাকিমের পোষা গরু এসে মুড়িয়ে খায়। এ ঘটনার তাৎপর্য ও ব্যঞ্জনা দ্বিবিধ : এই ঘটনা সংকেত করে যে রহিম-হাকিমের পুরোনো শত্রুতা আরো তীব্র হয়ে উঠবে। আর, একদিন রহিমের 'হৃদয়ের ফুল' ফুলজানও হাকিমের কুচক্রের ফাঁদে পড়ে তার জীবন থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়বে; তারও নাটকীয় পূর্বাভাস যেন এই ঘটনা।

যেহেতু নাটকটি একান্তভাবেই ব্যক্তিগত সুখদুঃখের জীবনকথা, তাই শুরু থেকেই রহিমকে তুলসীবাবু অত্যন্ত আবেগপ্রবণ করে দেখিয়েছেন। অবশ্য একটা যুক্তিবাদী প্রবণতাও সমান্তরালভাবে তার মধ্যে বহমান রেখেছিলেন তিনি। কিন্তু শেষপর্যন্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারে যুক্তি নয়, তার আবেগই তাকে পরিচালিত করেছে। তাই যে মানুষটি গাঁয়ের লোক উন্মত্ত হয়ে জোতদারের ধানের গোলা লুঠ করতে গেলে, তাদের যুক্তি দিয়ে নিরস্ত করেছে—সেই একই মানুষ ক্ষুধার্ত সন্তানের কান্নায় নিজের যুক্তি ভাসিয়ে দিয়েছে। তাই প্রখর আত্মাভিমানী হয়েও সে ফুলজানকে শেষপর্যন্ত পরমশত্রু হাকিমের লঙ্গরখানায় পাঠায় ওই পিতৃহৃদয়ের আবেগেই। আবার সেখান থেকে অপমানিত হয়ে অভুক্ত স্ত্রী ও পুত্র ফিরে এলে একই আবেগে সে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে বসে তাকে দুটো ভাত জোগাড় করে দেবার আকুলতায়। যুক্তি সেখানে সম্পূর্ণ পরাস্ত তার হৃদয়ের কাছে। আর এই প্রবল আবেগপ্রবণতাই শেষপর্যন্ত তাকে আত্মহননের পথেও ঠেলে দিয়েছে।

তাই দেখা যাচ্ছে এ কাহিনির প্লটের বিন্যাস প্রথম থেকে তুলসী লাহিড়ী এমনভাবেই করেছেন যাতে আত্মহনন অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায় কাহিনির যবনিকাপাতের প্রয়োজন। অবশ্য এ প্রসঙ্গে আরো কিছু কথা গুরুত্বপূর্ণ—রহিম আবেগপ্রবণ হলেও তার ব্যক্তিত্ব, মানসিকতা, সামান্য হলেও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা এবং বাইরের জগতের সঙ্গে খানিকটা যোগাযোগের ফলে, সে ধর্মীয় অপূর্ণতাকে অতিক্রম করে যাবার মনোবল অর্জন করতে পেরেছিল। কিন্তু তুলসীবাবু ফুলজানকে তেমন কোনো সুযোগ দেয় নি। ফলতঃ গ্রামের অশিক্ষিত মহিলা হবার কারণে তার পক্ষে অন্ধ সংস্কারের বিধান এড়িয়ে রহিমের অন্তরের ডাকে সাড়া দেওয়া সম্ভব হয়নি, মানসিক সংকীর্ণতার কারণেই। প্লটের এই বিন্যাসের ফলেই রহিম ও ফুলজানের পরস্পরের প্রতি আবেগের ঘাটতি না থাকলেও, মানসিকতার দিক থেকে তাদের অবস্থান হয়েছিল বিপরীত মেরুতে। তাই ওদের দুজনের যুগলজীবনের ছিঁড়ে যাওয়া তারটি আর কিছুতেই বাঁধা সম্ভব ছিল না। সে কারণে নাটকটিতে অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল দুজনের বিচ্ছেদ। ফলে কাহিনি সাঙ্গ করতে গেলে প্রবল আবেগচালিত কোনো একটি ঘটনা ঘটানো ছাড়া নাট্যকারের আর কোনো বিকল্প ছিল না। তাই শেষে রহিমকে আত্মহত্যা করতেই হয়। কারণ দুজনের মধ্যে সেই ছিল বেশি আবেগনির্ভর।

রহিমের আত্মহননের ঘটনাকে কেন্দ্র করেই নাটকটির শেষ দৃশ্যের পরিকল্পনায় একটি অভিনবত্ব এনেছেন তুলসীবাবু। 'বহুরূপী' নাট্যগোষ্ঠী যখন নিয়মিতভাবে 'ছেঁড়া তার' অভিনয় করতে শুরু করে, তখন তাঁরা রহিমের আত্মহত্যার ব্যাপারটি নিয়ে একটি সমস্যায় পড়েছিলেন। ওই নাট্যগোষ্ঠীর তৎকালীন অন্যতম প্রধান শিল্পী অমর গঙ্গোপাধ্যায়ের কথায় : "নানা জনের কাছ থেকে নানা কথা উঠতে লাগলো। নাটকের শেষে নায়ক যদি আশার বাণী না শুনিয়ে হতাশায় আত্মহত্যা করে, তাহলে নাটক দুর্বল হয়ে পড়ে। পক্ষে বিপক্ষে নানান যুক্তি দিয়ে আলোচনা হতে

থাকে। কখনো স্থির হয় এ নাটকের পরিণতিতে রহিমের মৃত্যুই স্বাভাবিক, আবার কখনো মনে হয় ফুলজানের মৃত্যুই অনিবার্য। শেষপর্যন্ত তুলসীবাবু শেষ অংশটা দুরকম করে লিখে শেষ রক্ষা করলেন। আমরাও কখনো রহিমের মৃত্যুতে নাটক শেষ করেছি; কখনো বা ফুলজানের মৃত্যুতে।" ["ছেঁড়া তার"; জাতীয় সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ; ১৩৭২, পৃ : ৫]

বস্তুতপক্ষে 'বহুরূপী' গোষ্ঠী যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন সেটি খুবই মৌলিক। কারণ, এ কথা ঠিকই যে নাটকের নায়ক যদি জীবন পলাতক হয়ে আত্মহননের পথ বেছে নেয়, তাহলে নাটকের গণমুখিন আবেদন দুর্বল হয়ে যায়; যা প্রগতিশীল কোনো নাট্য দলেরই কাম্য নয়। সেদিক থেকে ফুলজানের মৃত্যু ঘটালেও নাটকের অভিপ্রেত পরিণামটি মোটামুটি অক্ষুণ্ণই থাকে—অর্থাৎ রহিমের সঙ্গে তার অনিবার্য বিচ্ছেদ অথচ ঐ গণমুখিনতার ব্যত্যয়ও ঘটে না। তাই এক অভিনব পরিকল্পনায় শেষ দৃশ্যের দুটি পৃথক রূপান্তরণের প্রয়োজন হয়।

কিন্তু তা সত্ত্বেও যেহেতু প্লটের আধারেই কাহিনির যুক্তিগ্রাহ্য ও সম্ভাব্য বিন্যাস ঘটে তাই রহিমের মৃত্যুর মাধ্যমে সূচিত পরিণামটিই বরং অনেক বেশি করুণ ও মর্মস্পর্শী বলে বিবেচিত হয়। তুলসীবাবু তো এ নাটকে প্রতিরোধ বা সংগ্রামের পরিবর্তে মর্মস্পর্শিতাকেই মুখ্য করেছেন। তাই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র রহিমের মৃত্যুতে কারুণ্য যতটা প্রবল হয়ে ওঠে, ফুলজানের মৃত্যুতে সেটা সম্ভব নয়। কারণ রহিমের আত্মহননের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে থাকে তার গ্লানি, হঠকারী সিদ্ধান্তে জীবন ও পরিবারকে ধ্বংস করার অপরাধবোধ এবং সর্বময় ব্যর্থতার অনুভূতি যা থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় ছিল মৃত্যুই। এতগুলো ব্যঞ্জনা ফুলজানের মৃত্যুর সঙ্গে সংযুক্ত করা যেত না। তাছাড়া অতি আবেগপ্রবণ বলেই রহিমের পক্ষেই চকিত সিদ্ধান্তের বশে আত্মহত্যা করাটা নাটকের প্লটের গতিপথকেই সঠিকভাবে অনুসরণ করে যে সে কথাও বলাই বাহুল্য।

ফলে নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে অবকাশ থাকলেও, প্লট কিংবা নাটকের লিখিত মূল পাঠের সঙ্গে দুটি পৃথক রূপান্তরণ যে একেবারেই খাপ খায় না সে কথা অনস্বীকার্য।

৫.৭ নামকরণের তাৎপর্য

'ছেঁড়া তার' নাটকের নামকরণের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম আলংকারিক ব্যঞ্জনা নিহিত আছে। প্রত্যক্ষত এর মধ্যে শেষ দৃশ্যে রহিমুদ্দীর আত্মহত্যার ঠিক আগে তার হাতের অসতর্ক মোচড়ে দিলরুবার তার ছিঁড়ে যাওয়ার একটি ঘটনা আছে ঠিকই, কিন্তু শুধু ওইটুকুই এই নামকরণের সবটা তাৎপর্য সূচিত করে না।

আসলে এই তার ছিঁড়ে যাবার ঘটনাটির পরেই রহিম যেভাবে আকুল হয়ে কেঁদে উঠেছিল : "আল্লা! মোর যন্তর বাজিলয় না। আল্লা! তার খালি ছিঁড়ি ছিঁড়ি গেল।" [তৃতীয় অঙ্ক/তৃতীয় দৃশ্য]—এ থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে রহিম এখানে শুধু হাতের দিলরুবাটির তার ছেঁড়ার কথা বলছে না। যে 'যন্তর'-টি বাজল না—যার তার খালি 'ছিঁড়ি ছিঁড়ি গেল', সে আসলে তার হৃদয়বীণা—হাতের দিলরুবা—হয়ত বা দিলের রবাব।

এ কথার রূপকব্যঞ্জনার যে অন্তর্গত তাৎপর্য তার বিশ্লেষণ এরকম : রহিম বারংবার জীবনের নানা পর্বে ব্যর্থ হয়েছে; জীবনকে গড়ে তুলতে গিয়ে বিফলতাই জুটেছে তার ভাগ্যে। এ নাটকের যে ট্র্যাজেডি ঘটেছে, তার চূড়ান্ত যবনিকাপাত রহিমের মৃত্যুর মাধ্যমে হলেও, বহু আগে থেকেই নানা ঘটনা সেই পরিণামকে অনিবার্য করে তুলেছিল। সেই ঘটনাগুলিকেই রহিম 'তার' বারবার ছিঁড়ে যাওয়া হিসেবে নির্দেশ করেছে।

দেশে দুর্ভিক্ষ লাগলে আর সকলের সঙ্গে রহিমও বিপন্ন হয়েছে। অন্নের অভাবে তার মায়ের মৃত্যু ঘটেছে, নিরুপায় হয়ে সে শুধু তা প্রত্যক্ষ করতে বাধ্য হয়েছে নিষ্ক্রিয়ভাবে। কোনো প্রতিকার করতে পারেনি। স্ত্রী এবং একমাত্র পুত্রও

অনাহারে মরতে বসেছে দেখে শেষপর্যন্ত নিজের আত্মসম্মান জলাঞ্জলি দিয়ে রহিম তাদেরকে পাঠাতে বাধ্য হয়েছে পরমশত্রু হাকিমুদ্দীর বাড়ির চৌহদ্দীতে খোলা সরকারী লঙ্গারখানায়—যাতে তারা দুটি ভাত পায়। সরকারী হুকুমের ছুতো দেখিয়ে হাকিম সেই সরকারী খাবার থেকেও বঞ্চিত করে রহিমের স্ত্রী ও পুত্রকে। রহিমের স্ত্রী ফুলজানকে এরপর বলা হয় হাকিমের বাড়ির অন্দরমহলে গিয়ে খাবার ভিক্ষা চাইত।

স্ত্রীর চরম অপমান এবং তা নিরসন করতে না পারার অক্ষম অপরাগতা—এই অসহায়তা ও অসম্মানের পীড়নে অস্থির হয়ে ওঠে রহিম। সমস্যা সমাধানের দুর্বার প্রয়াসে সে ঝোঁকের মাথায় ফুলজানকে তালাক দিয়ে দেয় যাতে তাকে কেউ আর রহিমের 'স্ত্রী' হবার 'অপরাধে' সরকারী খাদ্য থেকে বঞ্চিত করতে না পারে।

রহিমের জীবনের এইটিই করুণতম ভ্রান্তি—তার হৃদয়বীণার সবচেয়ে সুরেলা তারটি সে নিজের হাতে ছিঁড়ে ফেলল ফুলজানকে তালাকনামা লিখে দিয়ে। এরপর থেকে তার অন্তরকেই অহরহ বেসুরো বেতালা করে দিয়েছে দুটি পরস্পর বিরোধী আবেগের উদ্দাম সংঘাত—একদিকে ফুলজানের প্রতি সুগভীর ভালোবাসা আর হঠকারিতার বশে তার প্রতি অকল্পনীয় অবিচার করে বসার আত্মগ্লানি; অন্যদিকে এক সুপ্রবল ধর্মসংস্কার যা তাকে নিরস্ত করছে তালাক অস্বীকার করে জোর করে ফুলজানকে ফিরিয়ে আনা থেকে। এমনকী বন্ধুদের পরামর্শে ফুলজানকে নিয়ে শহরে পালিয়ে যাবার কথা ভাবতেও সে গ্লানিবোধ করে, অপরাধী মনে করে নিজেকে শরিয়তী বিধান অমান্য করার কথা ভেবেছে মনে করে।

রহিমের জীবনে 'কোন হাহারবে' তার ছিঁড়ে যাওয়া বেদনা কিন্তু ওই ঝোঁকের মাথায় তালাক দেওয়াতেই সাঙ্গ হয়নি। হদিসের বিধান মেনে ফুলজানকে যাতে ফিরে পাওয়া যায় তার জন্যে আকুল হয়ে সচেষ্ট হয়েছিল রহিম। কিন্তু তার সেই প্রয়াসও ব্যর্থ হবার উপক্রম হলো কানা ফকির বনাম হাকিমুদ্দিনের কুৎসিৎ লালসার লড়াইয়ের সূত্রে। তখন মরিয়া হয়ে এতদিনের লালিত সমস্ত অন্তর্দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে জোর করে ফুলজানকে বাড়িতে নিয়ে আসে রহিম অসুস্থ সন্তানকে মায়ের সঙ্গ দিতে। কিন্তু 'হদীজ-খেলাপ' হবার ভয়ে ফুলজান তার ঘরে ঢুকতে অসম্মত হলে বীণার শেষ তারটিও ছিঁড়ে যায়।

মায়ের অনাহারে মৃত্যু, ক্ষুধার্ত স্ত্রী ও সন্তানের মুখে অন্ন জোগানোর জন্যে পরমশত্রুর বাড়িতে তাদের পাঠিয়ে আত্মসম্মান খোয়ানো, স্ত্রী-র চরম অপমানিত হওয়া, ঝোঁকের মাথায় উদ্ভ্রান্ত হয়ে তালাক দিয়ে আত্মগ্লানিতে জর্জর হওয়া, ফিরিয়ে আনার প্রয়াস করতে গিয়ে স্ত্রীকে দুটি ঘৃণ্য মানুষের লোভ ও লালসার বস্তু করে তোলা এবং সবশেষে ধর্মসংস্কারকে বিসর্জন দিয়ে ফুলজানকে ফিরিয়ে এনেও শেষপর্যন্ত সম্পর্ক জুড়তে ব্যর্থ হওয়া। এতগুলি গ্লানিময় ও অবমাননামূলক ঘটনা রহিমের মতো আবেগপ্রবণ মানুষের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হয়নি; মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি যে জীবনবীণার প্রতিটি তার একে একে এইভাবে ছিঁড়ে গেছে। হাতের অসতর্ক মোচড়ে দিলরুবার তার ছিঁড়ে যাওয়া এই সবকটিরই রূপক হিসেবে এ নাটকে ব্যঞ্জিত হয়েছে।

জীবনের যুগলবন্দীতে রহিম-ফুলজানের সুরে-লয়ে কখনো গরমিল হয়নি। তাই ঘটনা পরম্পরায় আপাত তাদের বিচ্ছেদ হলেও সেই শুধু বাইরের বিচ্ছিন্নতা; অন্তরে তা ঘটেনি। কিন্তু দুর্ভিক্ষের করালস্পর্শ, হাকিমুদ্দী দেওয়ানের দুরভিসন্ধি, আর জগদ্দল পাথরের মতো অনড়, অটল ধর্মীয় সংস্কার তাদের দুজনের সম্মিলিত হৃদয়রাগিনীর ছন্দকে এলোমেলো এবং অবশেষে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু ভালোবাসার সুর ছিল অক্ষুণ্ণ। শুধু পারিপার্শ্বিকের নির্মম পরিস্থিতিতে সে সুর তারা আর যৌথভাবে বাজাতে পারছিল না। প্রতিদিনের জীবনচর্চার অঙ্গীভূত তারগুলি ছিঁড়ে গেছিল দুর্ভিক্ষ, হাকিমুদ্দিন আর হাদিসের বিধানে। রহিম অবশ্য নতুন করে তার বেঁধে সেই সুরে আবার বাজাতে চেয়েছিল জীবনবীণাকে। কিন্তু আজন্মলালিত সংস্কার তাতে প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠায় নিজের অজান্তেই ফুলজান তাদের মিলিত জীবনবীণার শেষ তারটি ছিঁড়ে ফেলেছিল। যে বীণার তার ছিন্ন হয়েছিল উত্তেজনার বশে রহিমের তাকে তালাক দেওয়ার

সূত্রে।

নতুন করে তার বেঁধে সুর বাজানোর আকাঙ্ক্ষা তাদের দুজনেরই ছিলো, ছিলো না সাধ্য। পরে রহিম তাতে সমর্থ হলেও ফুলজান আর সেই সাহস করতে পেরে উঠল না। এরপর ছেঁড়া তার আর কোনো দিনই বাঁধা সম্ভভব হলো না রহিমের আত্মহত্যার পরিণামে—হৃদয়বীণা, জীবনরাগিনী সবই থেমে গেল চিরকালের জন্যে।

'ছেঁড়া তার' নামকরণটির অন্তরালে এভাবেই ব্যঞ্জিত হয়ে উঠেছে দুটি অসহায় মানুষের জীবনের করুণ ও নির্মম পরিণতি—ধর্ম, সমাজ অবস্থা ও ব্যক্তিগত শত্রুতা বারে বারে নিষ্ঠুর আঘাতে ছিঁড়ে দিয়ে গেছে তাদের জীবনবীণার তার—হাতের দিলরুবা আর দিলের রবাব—দুই-ই। তাই সুরহারা নিষ্প্রাণ হয়ে এ নাটকের ট্র্যাজেডিকে পরিসমাপ্তি দিয়েছে—ছিঁড়ে যাওয়া তার সেই বেদনারই দ্যোতক।

৫.৮ ট্র্যাজেডির উৎস ও পরিণতি : নেপথ্য পরিণাম

(ধর্মীয় সংস্কার/শ্রেণিশত্রুতা/দুর্ভিক্ষ)

'ছেঁড়া তার' নাটকে পঞ্চাশের মন্বন্তরকে পটভূমিতে রেখে উত্তরবঙ্গের একটি কৃষক পরিবারের বিধস্ত হয়ে যাবার কাহিনি বলা হয়েছে। তাদের জীবনের এই মর্মান্তিক ট্র্যাজেডির জন্য দুর্ভিক্ষের একটা ভূমিকা থাকলেও, ঘটনা পরম্পরায় কাহিনির যে পরিণতি সূচিত হয়েছে, তাতে গ্রামের উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিত্তবান এক সমাজপতির শত্রুতা প্রথমে এবং তারপর মুসলিম ধর্মের শরিয়তি বিধানের কিছু অমোঘ সংস্কারই নিয়ন্ত্রণ হয়ে উঠেছে। নাটকের নায়ক রহিম তুলসী লাহিড়ীর আগের বই "দুঃখীর ইমান"-এর নায়ক কি বিজন ভট্টাচার্যের "নবান্ন" নাটকের কুঞ্জের মতো নয়। সে বেশ খানিকটা লেখাপড়া জানা, সংস্কৃতিবান মানুষ—তাই ভালোমন্দ বিচারের ক্ষমতাটা একটু পরিশীলিত। আর সেই জন্যেই হাকিমুদ্দী দেওয়ালের শোষণ ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সেই গ্রামের মধ্যে প্রথম রুখে দাঁড়াতে পেরেছে; পেরেছে হাদিসের অন্ধ বিধানের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ করতে। এই গরীব কৃষক দুর্ভিক্ষে অন্নহীন হবার সূত্রে নিজের স্ত্রীপুত্রকে বাঁচাবার জন্য স্ত্রীকে তালাক দিতে বাধ্য হয়েছিল। এরই অনুষঙ্গে ধর্মীয় সংস্কারের অমোঘ তাড়নায় তার ও নাটকের ট্র্যাজেডি ঘটেছে।

শরিয়তি বিধান অনুসারে কোনো নারী তালাক পেলে তার সঙ্গে তার প্রাক্তন স্বামীর পুনর্বিবাহ তখনই সম্ভব যদি সে ইতিমধ্যে আর কারুর সঙ্গে নিকাহনামা পড়ে, তার সঙ্গে অন্ততঃ একদিনও ঘর করার পর তালাক নিয়ে আসে। এই জটিল ধর্মীয় বিধানটির সূত্রেই রহিম ও ফুলজানের যে বিচ্ছেদ আপাতভাবে অর্থনৈতিক কারণে ঘটেছিল—তা সম্পূর্ণ অন্ধ সংস্কারের নিয়ন্ত্রণে চলে গেল। এরই ফলে রহিমের আত্মহত্যা (পরবর্তীকালে এর বদলে ফুলজানের মৃত্যু ঘটনা) ও সমগ্র পরিবারটির বিপর্যয়।

এই তালাক কতটা অনিবার্য ছিল? দুর্ভিক্ষের কারণে গ্রামের সব চাষীর মতো রহিমরাও অন্নহীন হয়ে পড়েছিল। গ্রামের দুই মুরুব্বি-পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্ট আর হাকিমুদ্দী দেওয়ান সরকারী সাহায্যে লঙ্গরখানা খুলে বসে—অবশ্যই গরীব মানুষের বিপদে পাশে দাঁড়াবার জন্যে নয়—নিজেদের অর্থকরী স্বার্থেই। তারা জানে সরকারী চালডালের বরাদ্দের একটা বড়ো অংশ তারা সরিয়ে ফেলে বুভুক্ষু কৃষক জনতার কাছে নিজেদের প্রতিপত্তি জাহির করতে পারবে—তাদের দুমুঠো পেটের ভাতের জন্য নিজেদের কাছে তাদের মাথা নুইয়ে দিয়ে। আত্মাভিমানী রহিম নিজে তো একেবারেই যায়নি, এমনকি প্রথমে স্ত্রীপুত্রকেও প্রথমে এই লঙ্গরখানায় যেতে দিতে চায়নি। ফুলজানকে সে বলেছে "ফুলজান মোর দুষমণের বাড়ী গেইলে মোর মান যাইবে রে।" (দ্বিতীয় অঙ্ক/তৃতীয় দৃশ্য)। কিন্তু ক্ষুধার্ত সন্তানের কান্না সইতে না

পেরে সে স্ত্রী ও পুত্রকে লঙ্গারখানার অন্ন সংগ্রহের জন্য পাঠাতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু যেহেতু সে চৌকিদারী ট্যাক্স দেয় (অর্থাৎ ধরে নিতে হবে অন্যদের চেয়ে তার অবস্থা নাকি ভালো!); তাই তার স্ত্রীপুত্র লঙ্গারখানার খাবার পাবে না—এই মর্মে এক সরকারী আদেশের দোহাই দিয়ে রহিমের পরম শত্রু হাকিম দেওয়ান তাদের তাড়িয়ে দেয়। এই নির্মম ঘটনাই রহিমের বিচার-বুদ্ধিকে সাময়িকভাবে তছনছ করে দেয়।

সে ভাবে ফুলজানকে তালাক দিয়ে দিলে সে তো আর রহিমের স্ত্রী থাকবে না; তখন সরকারী লঙ্গারখানায় তার পুত্রের খাবার পেতে কোনো বাধা থাকবে না। তাই সে অগ্রপশ্চাত বিবেচনা না করে তালাকনামা লিখে ফুলজানের হাতে ধরিয়ে দেয়। স্পষ্টতই এই তালাকের ঘটনাটি ঘটল হাকিমুদ্দীর কুটিলতা ও অমানবিকতার প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়ায়। ফলে দুর্ভিক্ষের অনুষঙ্গ সরে গিয়ে এই পর্যায়ে মুখ্য হয়ে উঠল রহিমের সঙ্গে হাকিমের পুরোনো শত্রুতাটা।

এই তালাকের পরিণামে রহিম ও ফুলজানের মর্মান্তিক বিচ্ছেদে দুজনেই যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে যায়। একদিকে ফুলজানের জ্বলন্ত প্রশ্ন। কি তার দোষ; যার জন্যে স্বামী তাকে তালাক দিল। অন্যদিকে মুহূর্তের বুদ্ধি ভ্রংশের পরিণামে রহিমের মনেও তখন আত্মগ্লানির মমর্ন্তুদ যন্ত্রণা। ঠিক এই পর্যায় থেকেই দুর্ভিক্ষ ও শত্রুতাকে সরিয়ে কাহিনির মধ্যে ধর্মীয় সংস্কার প্রবল মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। যা এরপর আগাগোড়া নিয়ন্ত্রণ করেছে কাহিনি ও রহিমের জীবনকে।

হাদিসের বিধান অনুযায়ী তালাকপ্রাপ্তা ফুলজানের কাছে রহিম হয়ে গিয়েছে পরপুরুষ। তাই তাদের বাক্যালাপ নিষিদ্ধ এমনকী প্রাক্তন স্বামীর ঘরে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়া আপন সন্তানকে দেখার ব্যাপারেও রয়েছে ধর্মীয় বাধা। এই শরিয়তি সংস্কার ফুলজানকে নাটকের বাকি অংশ জুড়ে গ্রাস করে রেখেছে পুরোপুরি। রহিমের মনেও তার প্রভাব খুব কম ছিল না; সে বলেছে "মুসলমান হয়্যা হদীজ অমান্য কইরবার মুই-ও পারি না, তাঁয়ও পারে না।" [তৃতীয় অঙ্ক/প্রথম দৃশ্য]

কিন্তু এটাও সে মেনে নিতে পারে না যে ফুলজানকে অন্নসংস্থানের জন্যে দাসীবৃত্তি করতে হচ্ছে হাকিমের বাড়ীতে, তাদের একমাত্র সন্তান বসির মাকে হারিয়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তাই মর্মান্তিক যন্ত্রণায় সে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। যার শরিক ফুলজানও।

রহিমের হিতৈষীরা এই ভয়ংকর ধর্মীয় বিধানের ফাঁস থেকে রহিম, ফুলজান এবং বসিরকে মুক্ত করে তাদের জীবনে শান্তি ফিরিয়ে আনতে চায়। তারা কানা ফকিরকে রাজি করায় ফুলজানকে নিকাহ করে পরদিনই তালাক দেওয়ার ব্যাপারে। বলাইবাহুল্য ফকির এ প্রস্তাবে রাজি হয় যথেষ্ট অর্থের বিনিময়ে।

রহিমের বন্ধুরা স্থির করেছিল ফুলজানকে ফকির তালাক দিয়ে দিলে, তিন মাস দশ দিনের ইদ্দতের কাল ফুরোলে তাকে ও রহিমকে পুনর্বিবাহ দিয়ে সমস্যার সমাধান করবে। কিন্তু এই পরিকল্পনার সূত্রেই কানা ফকিরের সঙ্গে হাকিম দেওয়ানের কুৎসিৎ বিরোধ ঘনিয়ে উঠল। কারণ ফুলজানের ওপর হাকিমের কুনজর থাকায় সে নানান অজুহাতে নিকায় বাগড়া দিতে থাকে ।

গ্রামের উত্তেজিত জনতা হাকিমকে শাসাতে যায় এবং ক্ষিপ্ত রহিম ফুলজানকে হাকিমের বাড়ি থেকে ঠেলে নিয়ে আসে নিজের সন্তানের কাছে। যে আবারও ফুলজানকে বলে, "চল ফুলজান হামরা গাঁও ছাড়ি চলি যাই.....গুনাহ হইবে? আচ্ছা গুনাহগারের আখেরি কথাটা শুনি রাখ। এইটাই তোর ঘর। তোর ছাওয়াল নিয়া তুই এইঠিই থাকবু। [তৃতীয় অঙ্ক/তৃতীয় দৃশ্য]

কিন্তু ফুলজান বলে "এইঠে থাকিলে হাদিজ খেলাপ হয়।" [ঐ]—ধর্মের সংস্কারকে এইবারে রহিম পুরোপুরি

কাটিয়ে উঠতে পারে; সে বলে "নিকার নামে বেইজ্জত হলে হদীজ খেলাপ হয় না। ছাওয়াটাক্ বাঁদীর বাচ্চা বনাইলে হদীজ খেলাপ হয় না। যে মানুষটা একটা মুখের কথা থাকি বাঁচে, তার জিউটা দুই পায়ে থেঁতলাইলে হদীজ খেলাপ হয় না—না?" [ঐ]

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই তার হাতের দিলরুবার তার ছিঁড়ে যায়। শোকে, গ্লানিতে উদ্ভ্রান্ত রহিম ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়। ক্রুদ্ধ কৃষক জনতা যখন হাকিমকে মারতে মারতে রহিমের বাড়ি নিয়ে আসে। তখন দরজা ভেঙে দেখা যায় রহিম আত্মহত্যা করেছে।

অর্থাৎ রহিম এবং ফুলজান—দুজনের জীবনের নির্মম ট্র্যাজেডি ঘটবার পেছনে প্রবলতম কারণ হয়ে দাঁড়াল একটি অন্ধ ধর্মীয় সংস্কার-ই। একথা ঠিকই যে দুর্ভিক্ষের অনুষঙ্গেই এই ঘটনার মুখপাত ঘটেছে এবং তারপর বিত্তবান শ্রেণীশত্রুর শয়তানিতে তার পথ প্রশস্ত হয়েছে; কিন্তু পরিণামে অন্ধ ধর্মীয় সংস্কারের যূপকাষ্ঠে 'কোরবানী' হয়েছে একটি দরিদ্র কৃষক পরিবার। ক্রুদ্ধ কৃষক জনতা শয়তান হাকিম দেওয়ানকে রহিম ও ফুলজানের পুনর্মিলনের পথের বিঘ্ন দূর করতে প্রায় বাধ্য করে এনেছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত ফুলজানের মনে স্বামীসন্তানের জন্য আকুলতা এবং অন্ধ ধর্মসংস্কার। এই দুয়ের প্রবল লড়াইয়ে দ্বিতীয়টিই জয়ী হয়েছে এবং তারই পরিণামে অনিবার্য হয়ে উঠেছে রহিমের মর্মান্তিক আত্মবিসর্জন। অথচ রহিম কিন্তু পেরেছিল ধর্মীয় অন্ধ সংস্কারকে কাটিয়ে ফেলতে। স্ত্রী ও সন্তানের প্রতি ভালোবাসার টানে। তবু অঘটন ঘটল। আর তার জন্যে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠল ফুলজানের অন্ধ সংস্কারাচ্ছন্নতা, যা আর সবকিছুকে পরাজিত করল।

এই সূত্রেই আরো একটি কথা আলোচনার প্রয়োজন। ধর্মসংস্কার সংক্রান্ত যে প্রশ্নটি এখানে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, সেটি মূলত রহিম ও ফুলজানের মানসিকতাকে কেন্দ্র করেই। তারা সৎ ও ন্যায়পরায়ণ বলেই ধর্মবিশ্বাসটা ও তাদের কাছে গুরুতর একটি বিষয়। কিন্তু তাদের স্বধর্মাবলম্বী হাকিমুদ্দী দেওয়ানের কাছে ধর্ম বিধানটিই অপরকে পীড়নের একটি মোক্ষম হাতিয়ার হয়ে ওঠে। সরকারী নির্দেশকে যেমন সে রহিমের সঙ্গে শত্রুতা করার অছিলা হিসেবে ব্যবহার করেছে। ঠিক তেমনই হাদীসের বিধানকেও সে একইভাবে কাজে লাগাতে চেয়েছে বৈর নির্যাতনের জন্যে। সে এবং রহিম—দুজনেই যে সমধর্মী। তা তার কাছে আদৌ গুরুত্বপূর্ণ নয়; অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো এই ব্যাপারটি যে তারা দুজনে দুই পৃথক অর্থনৈতিক শ্রেণির অন্তর্গত যে দুটি শ্রেণির স্বার্থ পরস্পরবিরোধী। তাই মুসলমান হওয়া স্বত্ত্বেও রহিমের লাঞ্ছনা ও পীড়নে হাকিম একটু পরাঙ্মুখ হয়নি; কেননা তার চোখে রহিম এক মারাত্মক শ্রেণিশত্রু, যে তার সামাজিক আধিপত্যে আঘাত হেনেছে নির্ভীক প্রতিবাদের মাধ্যমে। আর এই সূত্রেই রহিম হয়ে উঠেছে হাকিমের ব্যক্তিগত পরমশত্রু। এই চরম ব্যক্তিগত শত্রুতার সম্পর্কটাই তাদের দুজনের মধ্যে সারা নাটক জুড়ে আগাগোড়া ক্রিয়াশীল থেকেছে। ফলতঃ তালাক সংক্রান্ত হাদীসের বিধানটিও যে এই শত্রুতার নিরিখেই হাকিম ব্যবহার করতে চেয়েছে। ধর্মসংস্কারজনিত কারণে নয়—সে বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই।

তাই এ নাটকে যে তিনটি উপাদান কাহিনীকে চালনা করেছে—দুর্ভিক্ষ, শ্রেণিশত্রুতা ও ধর্মীয় সংস্কার। সেগুলির গুরুত্ব বিচার করলে বোঝা যাচ্ছে দুর্ভিক্ষ দিয়ে সমস্যার সূত্রপাত হলেও, উচ্চবিত্ত হাকিম বনাম নিম্নবিত্ত রহিমের শ্রেণিশত্রুতা, যা পরে ব্যক্তিগত শত্রুতায় পর্যবসিত হয়। সেইটিই অধিক ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। আর এইসব কিছুকে ছাপিয়ে শেষ অবধি নাটকের পরিণতি সূচিত হয়েছে অন্ধ ধর্মসংস্কারের কাছে আত্মসমর্পণ করার মাধ্যমেই। ফলে নাটকের ট্র্যাজেডির মূল কারণ হয়ে দাঁড়াল ধর্মীয় সংস্কারের বিষয়টিই।

৫.৯ মুখ্য চরিত্রগুলির পর্যালোচনা

(ক) **রহিম :** বাংলা নাটকে সচরাচর যেরকম কৃষক চরিত্র আমরা দেখতে অভ্যস্ত, 'ছেঁড়া তার'-এর নায়ক রহিম তাদের মধ্যে বেশ খানিকটা ব্যতিক্রম। কুচক্রী জোতদার হাকিমুদ্দীর ষড়যন্ত্রে রহিমের বাবা সমস্ত জমিজমা হারিয়ে গরীব হয়ে পড়ে। সে জন্যে ক্লাসের 'ফার্স্ট বয়' হওয়া সত্ত্বেও লেখাপড়া ছেড়ে রহিমকে আত্মনিয়োগ করতে হয় চাষবাসে। নিজের নিষ্ঠা, সততা ও পরিশ্রমের ফলে আবার কিছুটা স্বচ্ছলতাও তার জীবনে এসেছে। ফুলজান তার বিবি, বসির তাদের একমাত্র সন্তান।

রহিম ছোট বয়সে লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে গান-বাজনাতেও পটু ছিল। শিক্ষা, সঙ্গীতপ্রেম, মার্জিত রুচিবোধ, পরিশীলিত বুদ্ধি এবং উন্নত ও প্রবল আত্মাভিমানী ব্যক্তিত্ব তাকে সাধারণের মধ্যে বিশিষ্ট করে তুলেছে। আর সেকারণেই বাংলা সাহিত্যের পরিচিত ছকের কৃষক চরিত্রগুলির মধ্যে সে ব্যতিক্রম। তার জীবনে যে ট্র্যাজিক পরিণতি ঘটেছে সেটির পিছনেও রহিমের মার্জিত রুচিসম্পন্ন সংবেদনশীল মন এবং ব্যক্তিত্ববোধ কিছুটা যে কাজ করেছে তাতে সন্দেহ নেই।

রহিম গ্রামের মানুষের মধ্যে অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদের প্রবণতা জাগাতে চায়। তার দুঃখ "মানুষগুলার হাত-পাও-মাথা সবে আছে। কিন্তুক কাঁও পুরা মানুষ নয়।" সে নিজে উৎপীড়ক হাকিমুদ্দীর সঙ্গে সমানে টক্কর দিতে ভয় পায় না। হাকিমুদ্দীর গরু এসে তার ফুলগাছ মুড়িয়ে খেলে, তাকে সে পিঁজরাপোলে পাঠাতে দ্বিধা করে না।

অথচ এই একই লোক দুর্ভিক্ষের সময় যখন ক্ষুধার্ত গ্রামবাসীরা ক্ষিদের জ্বালায় ওই হাকিমুদ্দীরই গোলা লুট করার কথা বলে, তখন তাদের বোঝাতে চায় যে লুটপাটে আসল সমস্যার সমাধান হয় না; বরং তাতে মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়।

রহিমের চরিত্রের এই দুটি বিশিষ্ট দিক আপাতভাবে পরস্পরবিরোধী। একদিকে আবেগপ্রবণতা, অন্যদিকে যুক্তিনির্ভরতা। যুক্তির মাধ্যমে সে সামাজিক জীবনে নিজের ভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় এবং চায় হাকিমুদ্দীর ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করতে। ওই যুক্তি ও বুদ্ধির সাহায্যেই, হাকিম যখন ষড়যন্ত্র করে তাকে মিথ্যে চুরির দায়ে পুলিশে দিতে চায়; সেটা সে ঠেকাতে সক্ষম হয়।

কিন্তু এরই পাশাপাশি তার অতি আবেগপ্রবণ স্বভাবের বশে সে এমন কিছু কাজ করে ফেলে যার পরিণাম হয় সুদূরপ্রসারী। ফুলজানকে তালাক দিয়ে ফেলা, হদীসের বিধান অমান্য করে তাকে নিয়ে দূরে চলে যেতে চাওয়া, কাহিনির শেষে আত্মহত্যা করা এসবের মধ্যে আবেগপ্রবণতার আধিক্যই প্রকাশিত।

তার চরিত্রের তৃতীয় মাত্রাটি হল প্রবল আত্মমর্যাদারবোধ। যা তাকে সর্বদাই সচকিত করে রেখেছে। এর জন্যেই সরকারী লঙ্গারখানা হলেও, সেটি হাকিমের বাড়ীতে বলে স্ত্রীপুত্রকে রহিম সেখানে পাঠাতে চায় না। কিন্তু ক্ষুধার্ত সন্তানের যন্ত্রণা সে সহ্য করতে পারে না। তাই আবেগের বশে সে তাতে এক সময় রাজি হয়ে যায়। এই মুহূর্তের আবেগতাড়না তার জীবনের যাবতীয় বিপর্যয়ের উৎসে। আবার কখনো এই আবেগের পেছনে তার একটি বিচিত্র যুক্তিবোধ ক্রিয়াশীল থাকে। তাই ফুলজানকে তালাক দেওয়ার হঠকারিতার নেপথ্যে তার এই ভাবনা কাজ করে যে : যেহেতু সে চৌকিদারী ট্যাক্স দিয়ে থাকে, তাই অর্থনৈতিকভাবে সে স্বচ্ছল (!)। অতএব সরকারী ফরমানে তার স্ত্রীপুত্র লঙ্গারখানায় খাবার পেতে পারে না। এই নির্মম নির্দেশনামা শুনে তার আবেগ যে অদ্ভুত যুক্তিশৃঙ্খলা খাড়া করল সেটি হলো এই যে—ফুলজানকে তালাক দিয়ে দিলে সে আর রহিমের স্ত্রী থাকবে না। তাহলে লঙ্গারখানায় খাবার পেতেও আর কোনো বাধা রইবে না।

আসলে যুক্তি ও আবেগের সহাবস্থান থাকলেও, রহিমের মন ও ব্যক্তিত্বে দ্বিতীয়টির প্রভাবই অধিক কার্যকরী

হয়েছে জটিল পরিস্থিতিগুলিতে।

রহিম ধর্মবিশ্বাসী যা তার আরো একটি চারিত্রিক মাত্রা। কিন্তু সেটা তার অন্তরের নিরঙ্কুশ বিশ্বাস। হাকিমুদ্দীর মতো সে ধর্মকে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার করে না—ভান করে না ধর্মের। তাই সে হাকিমকে মুখের ওপর বলতে পারে; "শয়তানী করি মানুষ ফাঁকি দেওয়া যায়, খোদাকে ফাঁকি দেওয়া যায় না।" তাই হাদীস অমান্য করে ফুলজানকে নিয়ে শহরে যাবার পরামর্শে সে শিউরে ওঠে : "মুসলমান হয়া হদীজ অমান্য কইরবার মুইও পারি না, তাঁয়ও পারে না।" ফুলজানকে তালাক দিয়ে সে বেদনায় দীর্ণ হয়ে গেলেও তাকে সে ফিরে পেতে চায় হাদীস-শরিয়ত মেনেই।

কিন্তু যখন সেই সৎ প্রয়াসে নানাধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হল, যথা, হাকিমুদ্দীর শয়তানী, ফুফার অনিচ্ছা, কানা ফকিরের ইতরতা, ফুলজানের ভবিষ্যত নিয়ে হাকিম ও ফকিরের মধ্যে কুৎসিত বিতণ্ডা, এই সময় থেকেই আবার যুক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী রহিম আত্মস্থ হতে শুরু করে। হাদীসের বিধান অমান্য করে সে জোর করে ফুলজানকে নিয়ে আসে নিজের বাড়ীতে একমাত্র সন্তানের আরোগ্য কামনায়। কিন্তু সে পারলেও, ফুলজান পারে না ধর্মের অন্ধ সংস্কারকে এড়াতে।

এই নিরুপায়তায় রহিম আবার অকস্মাৎ চরম আবেগতাড়িত হয়ে পড়ে। যার মর্মান্তিক পরিণতি হয় তার আত্মহত্যা। যেখানে তার যুক্তিবোধ সম্পূর্ণ বিসর্জিত হয়ে গেছিল।

এইভাবে সমস্ত নাটক জুড়েই রহিমের মধ্যে একদিকে যুক্তিবোধ, অন্যদিকে আবেগপ্রবণতা। এ দুয়ের অবিশ্রাম টানাপোড়েন চলেছে। সম্পূর্ণ বিপ্রতীপ দুটি মাত্রার সহাবস্থানের ফলে তার চরিত্রটি নাটকীয় বিচারে নিঃসন্দেহে খুব আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু নাটকের শেষে যখন সারা গ্রামের মানুষ রুখে দাঁড়িয়েছে হাকিমের বিরুদ্ধে; তখনই টানাপোড়েনের শিকার হয়ে রহিম আত্মহত্যা করে জ্বালা জুড়িয়েছে। নাটকের সমগ্র আয়তন জুড়ে সে প্রায় সর্বময় হয়ে থাকলেও, পরিণামে জীবনের সংগ্রামে এই পরাভব-স্বীকার তার চরিত্রকে ব্যর্থই করে দিয়েছে বলতে হবে।

(খ) **হাকিমুদ্দী :** এ নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র নিঃসন্দেহে রহিমুদ্দী। কিন্তু নাট্যচালনার সক্রিয়-মাধ্যম অবশ্যই হাকিমুদ্দী। যাকে এ নাটকের প্রতিনায়কও বলা যেতে পারে। হাকিমুদ্দী এখানে সমাজের সেই বর্গের মানুষদের প্রতিনিধি যারা নিজেদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির জোরে সাধারণ অসহায় মানুষের ওপর অত্যাচার চালায়। তাদের শোষণ করে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্যে। ধর্ম, মানবিক আবেগ, সম্পর্ক, সবকিছুই তাদের কাছে এই স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার মাত্র।

এরকই এক পাষণ্ড খল চরিত্র হলো হাকিমুদ্দী।

আকালের সময় যেখানে গ্রামের সর্বত্র অন্নাভাব, অসহায় মানুষের হাহাকার সেখানে তার বাড়ীতে তিনটি বড়ো বড়ো ধানের গোলা। গ্রামের লোকের ভেঙে পড়া মাটির বাড়ী আর তার দোতলা টিনের ঘর। তাছাড়াও তার চারজন বিবি রয়েছে। মেহেদী রাঙা পাকাদাড়ি শোভিত এই 'রসিক' লোকটি আবার সর্বদা তম্বী নিয়ে ঘোরে আর কথার মাত্রায় থাকেন আল্লা। অথচ শঠতা, কপটতা, মিথ্যাভাষণ কোনো কিছুতেই তার আপত্তি নেই। সুদ নিয়ে কারবার করে, কালোবাজারীতেও তার যোগাযোগ আছে।

গ্রামের অতি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন এই দেওয়ানের সঙ্গে গণ্ডগোলে জড়িয়ে পড়ে রহিম। বস্তুত দুজনেই একই ধর্মাবলম্বী হলেও ব্যক্তিত্বের সংঘাতই তাদের মধ্যে শত্রুতার প্রধান কারণ হয়ে ওঠে। সৎ, প্রতিবাদী রহিম নানান ভাবে বিদ্রোহ করে হাকিমের অনাচার ও অপরাধের বিরুদ্ধে। তার এই 'দুঃসাহস' দেখে যারপরনাই ক্রুদ্ধ হয় হাকিমুদ্দী। তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে সে এমনকী চুরির মিথ্যা মামলাতেও রহিমকে ফাঁসাতে চায়।

গ্রামের লোকের ওপর নিজের আধিপত্য বজায় রাখতে সে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে শহরে গিয়ে বিশেষ দরবার করে নিজের বাড়িতেই সরকারী লঙ্গরখানা বসাবার ব্যবস্থা করে। বুভুক্ষু মানুষকে দুটো মুখের ভাত জোগানোর অছিলায় সে মূলত ফন্দি করে লঙ্গরখানা থেকে সরকারী বরাদ্দ চালডালের বৃহদংশ আত্মসাৎ করে গোলাজাত করবে যাতে কালোবাজারে দুর্ভিক্ষের সময় তার বাড়তি মুনাফা হয়। এ দুরভিসন্ধিতে তার সহায়ক হয় গ্রামের বোর্ড-প্রেসিডেন্ট কারণ দুজনেই বোঝে যে নিরন্ন মানুষগুলোর মুখে সামান্য ভাতটুকু দিলেই তারা সন্তুষ্ট হয়ে ধন্য ধন্য করবে। তাদের দুজনের গোলাভরা ফসলের দিকে ওরা আর নজর দেবে না।

এতেও তার মন ভরল না। তাই গরীব অভুক্ত গ্রামবাসীদের সে ধান কর্জ দিল এক নির্মম শর্তে যা তার স্বভাবের প্রতারক ও অমানবিক দিকটিকেই তুলে ধরে।

এই অমানবিকতা আরো প্রকট হলো যখন সে সরকারী বিধানের অজুহাত দেখিয়ে রহিমের স্ত্রী ফুলজান ও ছেলে বসিরকে লঙ্গরখানা থেকে খাবার না দিয়ে তাড়িয়ে দিল। বস্তুত এখানে রহিমের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত শত্রুতার দিকটাই বড়ো হয়ে উঠল। তাই রহিমকে জব্দ করার জন্যে সে তার প্রাণাধিক স্ত্রী ও সন্তানকে নিপীড়ন করল।

এই ঘটনার ফলশ্রুতিতেই ঘটে গেল "ছেঁড়া তার" নাটকের সবচেয়ে মর্মান্তিক ট্র্যাজেডিটি। অর্থাৎ রহিম-ফুলজানের তালাক যা এরপর থেকে সমগ্র কাহিনিটিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। এই ভাবে হাকিমুদ্দী তার ক্ষমতার জোরে নাটকের এবং নাটকের মুখ্য চরিত্রের অর্থাৎ রহিমের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারল।

গ্রামের সমস্ত সাধারণ মানুষই হাকিমের নিপীড়নের শিকার হয়েছে নানাভাবে। অথচ তার সরকারী প্রতিপত্তি ও অর্থবলের কারণে কোনো দিনই প্রতিবাদ করতে পারেনি। একমাত্র প্রতিবাদী মানুষ ছিল রহিম। ফুলজানের সঙ্গে বিচ্ছেদে সে-ও আত্মহারা হয়ে ছেলেকে নিয়ে শহরে চলে গেল। এবারে নিষ্কণ্টক হয়ে হাকিম তার অত্যাচার চালিয়ে যেতে লাগল গ্রামের অসহায় মানুষগুলোর ওপর। তালাকপ্রাপ্তা অসহায় ফুলজান আশ্রয় নিতে বাধ্য হল হাকিমের বাড়িতে দুটি পেটের ভাতের জন্য। তার সম্পর্কে হাকিমের কদর্য ব্যভিচারী মনোভাব নানা ইঙ্গিতে প্রকাশ করতে পরাঙ্মুখ হল না চারটি স্ত্রীওয়ালা এই দেওয়ান। এমনকী ফুলজানকে নিকা করে নিজের বাসনা চরিতার্থ করার (এবং অবচেতনে পরমশত্রু রহিমকে আরো অপমান করা) ইচ্ছাও সে পোষণ করত। কিন্তু তার এই আকাঙ্ক্ষায় বাধা পড়লো অকস্মাৎ রহিম গ্রামে ফিরে আসায়।

রহিম ও ফুলজান এবং সর্বোপরি বসিরের বেদনায় মর্মাহত হয়ে রহিমের বন্ধুরা স্থির করেছিল হদীসের নিয়ম মেনে ফুলজানকে কানা ফকিরের সঙ্গে নিকাহ দেওয়া হবে, যাতে কানা ফকির তাকে তালাক দিলে ইদ্দতের কাল শেষ হয়ে গেলে রহিম পুনরায় ফুলজানকে বিয়ে করতে পারে। কানা ফকির অর্থের বিনিময়ে সহজেই রাজী হয়ে যায় এই প্রস্তাবে। এদিকে মুখের গ্রাস লুঠ হয়ে যায় দেখে, হাকিম আর স্থির থাকতে পারে না। সোজা এসে চড়াও হয় রহিমের বাড়ী। অসুস্থ বসিরকে ফুলজানের দেখার ব্যাপারে প্রথমে ইসলাম ও ধর্মীয় বিধানের দোহাই দিয়ে বাধা দিতে চায় যে; তারপর কানা ফকিরের সঙ্গে ফুলজানকে নিয়ে বিকৃত ও ঘৃণ্য দরকষাকষি শুরু করে হাকিম।

তার লালসা, ঘৃণ্য স্বভাব এবং সর্বোপরি রহিমকে সর্ব অর্থে 'জানেপ্রাণে' মেরে ফেলবার ঐকান্তিক প্রয়াস ফুটে ওঠে তার এই আচরণে। প্রয়াস সফলও হয় তার।

আত্মাভিমানী রহিম ফুলজানের এই অপমানে দিশেহারা হয়ে কানা ফকিরকে তাড়িয়ে দিয়ে হাদীস অমান্য করে ফুলজানকে আনতে যায় হাকিমের বাড়ী। একমাত্র সন্তান বসিরকে বাঁচানোর তাগিদে। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরী হয়ে গেছে। হাকিমের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। হাদীসকে ফুলজান অমান্য করতে পারে না। রহিমের জোরাজুরিতে বাড়ী ফিরে এলেও, সে সেখানে থাকতে রাজি হয় না। সব আশাভরসা শেষ হয়ে যাচ্ছে দেখে রহিম পাগলের মতো হয়ে

যায়। ঘরে ঢুকে আত্মহত্যা করে সে। হাকিমের এক চালে তার শত্রুনিধন হয়ে যায়।

কিন্তু গ্রামের লোকেরা আর নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকতে পারে না। রহিমের জীবনের এই মর্মান্তিক পরিণতিতে তারা ক্ষোভে ফেটে পড়ে। তাদের সকলের শ্রেণিশত্রু পরম অত্যাচারী এই নিষ্ঠুর হাকিমুদ্দীর ওপর তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে তার সব অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে। সৎ এবং অসৎ এর মধ্যে নাটক জোড়া যে দ্বন্দ্ব দুটি প্রতিস্পর্ধীমাত্রার সৃষ্টি করেছে। নাটককে গতি দিয়েছে। রহিমের মৃত্যু আর হাকিমের পরাভবে সূচিত হয়েছে নাটকের সমাপ্তি। আর এই বৃত্তায়ন সম্পূর্ণ হয়েছে হাকিমের সক্রিয় শঠতা ও অসাধু ও কুটিল ষড়যন্ত্রের পরিণামেই। এ নাটকের ভিলেন হয়েও এইভাবেই হাকিমুদ্দী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে নাটকের গতিসঞ্চারে অবয়ব গঠনে।

(গ) **ফুলজান :** রহিম বনাম হাকিমের ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের ঠিক মাঝখানে রয়েছে রহিমের স্ত্রী ফুলজানের চরিত্রটি। নাটকের গোড়ায় রহিমের সঙ্গে হাকিমের সংঘাতটা ব্যক্তিত্বের লড়াই হলেও, তারপর থেকে নাটকের শেষ অবধি তাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের কেন্দ্রবিন্দু হয়েছিল ফুলজান-ই।

নিরপরাধ এই গৃহবধূ রহিমের সঙ্গে বিয়ের আগে তার ফুফার আশ্রয়ে বড়ো হয়েছে। পিতৃমাতৃহীন এই মেয়েটি একটু সুখের মুখ দেখেছিল রহিমের ঘরণী হয়ে। মুক্তমনা, শিক্ষিত এবং সংস্কৃতিবান রহিম স্ত্রীকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসত। নিজের আধুনিক মানসিকতার ছাঁচে তাকে চাইতো সাজাতে। তাই শহর থেকে জুতো কিনে এনেছিল। স্বামীর প্রতি ভালোবাসায় ঘাটতি না থাকলেও গ্রামের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকা ও অশিক্ষার কারণে ফুলজান সংস্কার মুক্ত হতে পারেনি। তাই সে বলে "হামার গেরামের কোন বেটী ছাওয়াটা জুতা পিঁধে?" যুক্তিহীন এই সংস্কারাচ্ছন্নতাই তার জীবনের সবচেয়ে বড়ো শত্রু হয়ে দাঁড়াল পরে।

আকালের সময় ক্ষুধার্ত ছেলের কান্নায় তার মাতৃ হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়। রহিমের পরমশত্রু হাকিমের বাড়ীতে যায় সে সরকারী লঙ্গরখানায় খাবার পাবার আশায়। যখন ফিরে আসে অপমানিত ও বিতাড়িত হয়ে, তখন তার প্রতি স্বামীর নিখাদ ভালোবাসাই তার জীবনের সবচেয়ে বড়ো বিপর্যয় ডেকে আনল। স্ত্রীর এই অপমানে দিশেহারা হয়ে রহিম তাকে তালাক দিয়ে বসে, যাতে রহিমের স্ত্রী হবার 'অপরাধে' আর কখনো তাকে বঞ্চিত না হতে হয় দুটি পেটের ভাত জোগাড় থেকে। রহিম সম্পর্কে ব্যক্তিগত আক্রোশবশত হাকিম সরকারী বিধানের ছুতোয় ফুলজানকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। তাদের এই পারস্পরিক শত্রুতার বলি হল অসহায় ফুলজান। তার বেদনার মাত্রা তীব্রতর হল কারণ স্বামীর সঙ্গে তার পারস্পরিক আবেগে কোনো ঘাটতি ছিল না তাও তালাক পেল সে। তবু আশা হারায়নি তার। কারণ স্বামী তাকে কথা দিয়েছিল অচিরেই সে সব ঠিক করে দেবে। কিন্তু ফুলজানের বেদনা তাতেও কমে না। ভালোবাসায় গড়া সংসার, স্বামী, একমাত্র সন্তান বসির। তালাকের নিয়মে সবই যে তার কাছে আজ "পর" হয়ে গেছে। তাই আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে তাকে ঠাঁই নিতে হয় হাকিমের বাড়ীতে "বাঁদী" হিসেবে।

এই ঘটনার অব্যবহিত পরে রহিম ছেলেকে নিয়ে গাঁ ছেড়ে শহরে চলে যায়। ফুলজানকেও নাটকে দীর্ঘক্ষণ আর চাক্ষুষ দেখা যায় না। কিন্তু মায়ের জন্য বসিরের আকুলতা আর মুহূর্তের বিভ্রমে স্ত্রীর প্রতি চরম অন্যায় করে ফেলার অপরাধে রহিমের হাহাকার। এ দুই তীব্র আবেগের মাধ্যমে ফুলজানের অস্তিত্ব জাগরূক হয়ে থাকল নাটকের এ পর্যায়ে তার অনুপস্থিতি স্বত্ত্বেও।

এরপর রহিম গ্রামে ফিরে আসে। হাদিসের বিধান মেনে ফুলজানকে নিকা করে জীবন, সংসার ও সন্তানকে নতুন আশার আলো দেখাতে প্রয়াসী হয় সে।

কাহিনীতে আবারও সক্রিয় হয়ে ওঠে হাকিম। বরং বলা ভালো রহিমের প্রতি হাকিমের বিদ্বেষ। হাদিসের দোহাই দিয়ে সে ফুলজানকে বাধা দেয় রহিমের ঘরে গিয়ে তাদের অসুস্থ সন্তান বসিরকে দেখতে; বলে তালাকের পরে রহিম

তার কাছে "পরপুরুষ"। তাই তার ঘরে গেলে ফুলজানের গুনাহ হবে।

আগেই ফুলজানের সংস্কারাচ্ছন্নতার যে কথা বলা হয়েছে, তা এখানেও ক্রিয়াশীল হয়। 'পাপে'র ভয়ে সন্তান মায়ের বিহনে মৃতপ্রায় জেনেও সে সন্তানের কাছে যেতে পারে না। কিন্তু মাতৃহৃদয় তা মানতে পারে না। তাই রহিমের ঘরের ভাঙা বেড়ার ফাঁক দিয়ে সে লুকিয়ে দেখতে যায় অসুস্থ বসিরকে।

নাটকের শেষ পর্বে ফুলজানের অস্তিত্ব সর্বময় হয়ে ওঠে। তাকে নিকা করার সূত্রে রহিম ও হাকিমের দ্বন্দ্বের ভাগীদার হয় আরেকজন কানা ফকির। আসলে ইসলামী নিয়মমতে কানা ফকিরের সঙ্গে নিকার একদিন পরেই ফুলজানকে সে তালাক দিলে, ইদ্দতের কাল শেষে রহিম আবার তাকে নিজের ঘরণী করতে পারবে। এমনই ব্যবস্থা করেছিল রহিমের বন্ধুরা। বলাবাহুল্য গরীব ও লোভী ফকির বেশ খানিকটা অর্থের বিনিময়ে এ কাজে সহজেই সম্মতি দিয়েছিল। ধর্মীয় বিধানের কারণে নিরুপায় হয়েই এই ব্যবস্থা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল রহিম এবং ফুলজানও। কিন্তু সমস্যা তৈরি হল, যখন কানা ও রহিমের এই চুক্তির মধ্যে হাকিম নাক গলালো তার ব্যক্তিগত অভিসন্ধি চরিতার্থ করতে। তার চারটি বিবি থাকা সত্ত্বেও ফুলজানের প্রতি কদর্য লালসার কারণে সে উঠে পড়ে লাগল কানার সঙ্গে ফুলজানের নিকাহ ভেস্তে দিতে। অবশ্য এর পেছনে রহিমকে কোনোভাবেই স্থিতি ও সুখ পেতে না দেবার প্রতিহিংসাও ক্রিয়াশীল ছিল যে, তা বলাই বাহুল্য।

এইখান থেকেই ফুলজান যেন হয়ে দাঁড়াল দুটি কামার্ত পশুর লালসার লড়াইয়ের উপলক্ষ। স্বামীর কাছে, সন্তানের কাছে ফিরে যাবার মাশুল হিসেবে সে পরিণত হল লোভের উপকরণে। তাকে নিয়ে ফকির ও হাকিমের নির্লজ্জ দরকষাকষি ও অশ্লীল ইঙ্গিত তার নারীত্ব, মাতৃত্ব এবং সর্বোপরি স্ত্রী মর্যাদা সবকিছুকে যেন ক্লেদাক্ত করে তুলল। অথচ এই পুরো প্রক্রিয়াটায় তার নিজস্ব কোনো ভূমিকা, কি অপরাধ—কিছুই ছিল না।

এই পরিস্থিতিতে অবশেষে তার সমস্ত সংস্কার মুছে ফেলে ভালোবাসার অধিকারে ফুলজানকে জোর করে নিয়ে আসে হাকিমের বাড়ি থেকে তাকে পণ্য করে তোলার অপমান থেকে মুক্তি দিয়ে সন্তানের জননী, আর সংসারের ঘরণী হিসেবে ফিরিয়ে দিতে চায় তার অপহৃত সম্মান। এইভাবে নিজের অপরাধের প্রায়শ্চিত্তও করতে চায় রহিম।

আবেগের টানে ফুলজান চলে আসে, কিন্তু তার পায়ের বেড়ি হয়ে দাঁড়ায় আজন্মলালিত ধর্মীয় কুসংস্কার। অসুস্থ সন্তানকে কোলে নিয়ে সে সাময়িক যন্ত্রণামুক্তি পেলেও, রহিমের ঘরে ফিরে যাবার আহ্বানে সাড়া দিতে পারে না। হৃদয় বনাম আজন্মের সংস্কারের লড়াইয়ে জয়ী হয় দ্বিতীয়টিই। আর এই মর্মান্তিক সত্য অনুধাবনে, অভিমানী রহিম বেছে নেয় আত্মহননের পথ। জীবন পরাজিত হয়, ভালোবাসা হেরে যায়।

ঠিক সেই মুহূর্তে ফুলজানও এক নিমেষে ছিন্ন করতে পারে তার সংস্কারের বন্ধন। পরমপ্রিয় ভালোবাসার মানুষ 'পরপুরুষ' রহিমের মৃতদেহের ওপর আছড়ে পড়ে সে ডুকরে কেঁদে ওঠে সর্বরিক্ত হবার নির্মম আঘাতে। গুনাহের ভয় আর তখন নেই। কিন্তু বড়ো দেরীতে এই মানসমুক্তি ঘটে তার। সৎ, নিরপরাধ, পতিপ্রাণা, স্নেহশীলা মাতা এই অসহায় মেয়েটি একদিকে সমাজপতির ক্ষমতার আর অন্যদিকে ধর্মীয় অনুশাসনের দোরোখা নিপীড়নে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে গেল। তাই নাটকের শেষে ফুলজানের জন্য পাঠকের অন্তরে সঞ্চারিত হয় অপরিসীম বেদনা ও মমতা।

৫.১০ গৌণ চরিত্রের পরিচয়

(ক) **মহিম :** রহিমের সহপাঠী বাল্যবন্ধু। জীবনে অত্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়েও প্রথম বয়সের প্রিয় সুহৃদকে ভোলেনি সে। এখনও তাকে সে খুব ভালবাসে এবং শুধু রহিমের জন্যেই নয়, তার স্ত্রী-পুত্রের জন্যেও খুশি হয়ে উপহার কিনে দেয়। যে দিলরুবাটি এই নাটকের প্রতীকসংকেত বলে গণ্য হতে পারে, সেই বাজনাটিও রহিমের হাতে তুলে দেয় মহিমই। রহিমের চূড়ান্ত দুঃসময়ে মহিমই তাকে সাহায্য করেছে, এমনকি সেই আকালের প্রহরেও তাকে যা হোক একটা চাকুরি জোগাড় করে দিয়েছে। মহিমকে এই নাটকের সর্বার্থেই একটি প্রীতিময় চরিত্র বলে ধার্য করতে পারি।

(খ) **কানা ফকির :** রহিমের সবচেয়ে বড় শত্রুদের মধ্যে এই ফকির দ্বিতীয় জন (প্রথম জন বলাই বাহুল্য, হাকিমুদ্দী)। এই লোকটি হাকিমুদ্দীর খয়ের-খাঁ-গোছের মানুষ ছিল, পুলিশের সামনে হাকিমুদ্দীর আনা চুরির অভিযোগে রহিমের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছিল, যদিও তা ধোপে টেঁকেনি। ফকির হলেও সে অর্থলোলুপ এবং কামাসক্ত, দুশ্চরিত্র। হাকিমুদ্দীয় সঙ্গে ঝগড়ার সময় তার গোপন ঘৃণ্য ব্যাধির কথা ফাঁস হয়ে গেলে সে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। হাকিমের মতো সেও ফুলজানের প্রতি প্রবল লালসাপরায়ণ। আবার রহিমের তালাকী-বিবি ফুলজানকে নিকাহ্ এবং তালাকের জন্যে অসহায় ও দরিদ্র রহিমকে চাপ দিয়ে বেশি টাকা আদায় করতেও সে প্রবলভাবে সক্রিয়। সবদিক দিয়ে বিচার করলে, সে হাকিমুদ্দীয় মতো না হলেও শয়তানিতে বড় কম যায় না।

(গ) গৌণ চরিত্রগুলির মধ্যে কয়েকজনের কথা প্রসঙ্গসূত্রে বলাই যায়। যেমন, সুশান্ত, গোবিন্দ, শ্রীমন্ত, রহিমের মা। মহিমের বন্ধু সুশান্ত ও তার মতনই সহৃদয়, দুঃখী রহিমকে সে কয়েকবারই সান্ত্বনা দিয়ে, সহানুভূতি জানিয়ে তাকে একটু স্বস্তি দিতে চেষ্টা করেছে। গোবিন্দ এবং শ্রীমন্ত—এরা দুজনে রহিমের যথার্থ বন্ধু। নিজেরা দীন-দুঃখী হলেও, রহিমকে তারা যথাসাধ্য চেষ্টায় সাহায্য করেছে বারবার। গোবিন্দ স্বভাবে মজাদার মানুষ, শত দুঃখেও হাসি-ঠাট্টা-গান-গল্প করে সে। কিন্তু গভীর জীবনবোধও আছে তার। শ্রীমন্ত সাধারণ, সরল গ্রাম্য মানুষ। কিন্তু অন্যের কাছ থেকে ধার করে এনেও রহিমকে খাওয়াতে ব্যগ্র হয়েছে সে। দুর্বল স্বভাব, হাকিমুদ্দীকে ভয় পায়। তাকে তোষামোদও করে। কিন্তু মনুষ্যত্ব বিচ্যুত একেবারেই নয়। রহিমের মা দরিদ্র, কিন্তু মানসিকভাবে সম্ভ্রান্ততা আছে তাঁর। না খেয়ে মৃত্যু অনিবার্য, তবু তিনি পরিবারের সম্মান নষ্ট করে শয়তান হাকিমের কাছে অন্নভিক্ষা করেননি ; পরিণামে প্রাণও বিসর্জন দিয়েছেন।

৫.১১ নাটকের প্রাসঙ্গিকতা ও সামগ্রিক মূল্যায়ন

ইংরেজিতে যাকে 'পিরিয়ড-পিস্' (বিশেষ একটি কালকেন্দ্রিত সৃষ্টি, যার মধ্যে সমকালের ইতিহাস সুচিহ্নিত হয়েছে বলে), এমনই একটি নাটক হল 'ছেঁড়া তার'। পঞ্চাশের ভয়াবহ মন্বন্তর নিয়ে যে দুটি বাংলা নাটকের নাম সর্বাগ্রে উচ্চারিত, তাদেরই অন্যতম এটি (আরেকটি হল, বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন')। সেই ভয়াল আকালের ছবি এতে মর্মান্তিক এবং বিশ্বাসযোগ্যভাবেই রূপায়িত হয়েছে। ঐ সময়ের জনজীবনের ইতিহাসকে এই নাটকের মাধ্যমে এতকাল পরেও যথাযথ রূপে চেনা যায়। ঐ দুর্ভিক্ষ যে মানুষের তৈরি ছিল এবং শাসকগোষ্ঠী তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থকে বাড়িয়ে তুলতেই এটির সংঘটন করেছিল, এ নাটক সেই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে। সমাজ ও অর্থনীতির উঠাপড়ার ক্ষেত্রে যাঁরা অভিনিবিষ্ট, তাঁদের কাছে তাই এর আবেদন আজও অক্ষুণ্ণ।

শিল্পগুণ বিচার করলে এ নাটকে অবশ্য খাম্‌তি নেই এমনটা বলা যাবে না। শেষ দিকে মেলেড্রামা বা অতি নাটকীয়তার ছোঁয়া এতে লেগেছে; বিশেষত ফুলজানকে রহিমের তালাক দেবার আকস্মিকতায় কিংবা রহিমের আত্মহননে (পাঠান্তরে, ফুলজানের মৃত্যুতে)। অধিকাংশ চরিত্রই একমাত্রিক। যে মন্দ, সে নিরঙ্কুশভাবে খারাপ। আবার যে ভাল,

তার কোনই ত্রুটি নেই। দুয়েকটি গৌণ চরিত্র অবশ্য এর ব্যতিক্রম।

তবে এ সত্ত্বেও, এ নাটকের আবেদন মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করে। 'নবান্ন'-র মতো আশার আলো এর শেষে না দেখা গেলেও, জনপ্রতিবাদ ও প্রতিরোধ এখানেও আছে। সবটাই হতাশায় ভেঙে পড়ে আত্মসমর্পণ নয়। তাই সামগ্রিক মূল্যায়নে এইসব কিছুরই যোগ-বিয়োগ এর বিচার করতে গেলে, করতেই হবে।

৫.১২ এই নাটকের ভাষা, সংলাপ এবং গান

তুলসী লাহিড়ী ছিলেন অবিভক্ত বাংলার উত্তরাঞ্চলের রংপুর জেলার মানুষ এবং তাঁর জীবনের অনেকগুলো বছর সেখানেই অতিবাহিত হয়। এই নাটকে গ্রামের মানুষের মুখে ঐ অঞ্চলের কথ্যভাষাই শোনা যায়। রংপুরী এই বিভাষা সম্পূর্ণতই বাংলার বরেন্দ্রী উপভাষার (ডায়ালেক্ট) অন্তর্গত। বরেন্দ্রীর মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলির সবই এর মধ্যে পাওয়া যায়। 'গাবুর' (যুবক), 'ছাওয়া' (ছেলে), 'খুলীৎ বসি' (ফাঁকা মাঠে বসে), 'ছিড়া ফাটা ছ্যাওটা' (ছেঁড়া শাড়ি), 'চ্যাংড়া' (ছেলেছোকরা), 'কাউটাল' (অশান্তি) ইত্যাদি অজস্র স্থানীয় শব্দ খুব স্বচ্ছন্দেই এর মধ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। বরেন্দ্রী উপভাষার সর্বনাম এবং ক্রিয়াপদ বিধান এর সর্বত্রই দেখা যায়; যেমন : 'বাঁচবু', 'পালেয়া যাইবু', 'হাপসাইছো', 'হলু', 'গেছিনো', 'থাইকন্যার', 'খোয়াইবে' (যথাক্রমে, বাঁচব, পালিয়ে যাবে, শোক প্রকাশ করছ, 'হলি', গিয়েছিলাম, থাকতে, খাওয়াবে) ইত্যাদি; এবং 'হামার', 'মোক', 'উয়াত', 'তাঁয়' (আমার, আমাকে, ওতে, তাকে) ইত্যাদি।

সংলাপের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, নাগরিক চরিত্র মহিম, সুশান্ত, মহিমের ছেলেমেয়ে, দারোগা। এরা সকলেই মান্য বাংলা কথ্যভাষায় কথা বলেছে। রহিম যখন মহিমদের সঙ্গে কথা বলেছে, তখন তার শব্দপ্রয়োগ এবং বাগ্‌ভঙ্গী অনেক শীলিত; কিন্তু গ্রামের মানুষজনের সঙ্গে কথা বলার সময়ে তার মুখের সংলাপ ঠিক তাদের মতোই। হাকিমুদ্দীর মুখের ভাষায় একটু আরবি-ফারসি-উর্দুর উপস্থিতি দেখা যায়। ফুলজান এবং রহিমের মায়ের মুখে মেয়েলি শব্দ এবং বাচনভঙ্গি স্বাভাবিকভাবেই বেশি পরিমাণে এসেছে।

স্পষ্টতই, ভাষা এবং সংলাপের ব্যবহার করার সময়ে তুলসী লাহিড়ী বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন। আর এ জন্যই 'ছেঁড়া তার'-এর ভাষাগত বাস্তবধর্মিতা এতটা বিশ্বাসযোগ্য।

□

এই নাটকে গানের সংখ্যা মোট আটটি। মহিমের কন্যা মায়া (১টি), রহিম (৩টি), গোবিন্দ (২টি), হাকিমুদ্দীর আধিয়ার (১টি) এবং কালীনাচের দলের জাম্বুবান-সাজা শিল্পী (১টি) এই গানগুলি গেয়েছে। এদের মধ্যে হাকিমুদ্দীর আধিয়ারের (অর্থাৎ, ভাগচাষি) গানটির প্রত্যক্ষভাবে মঞ্চায়ন হয়নি; রহিমের কথার মধ্যে ঐ 'শোল্লোক' (সুরে-বাঁধা ছড়া/গান) উল্লেখিত হয়েছে।

এই গানগুলির মধ্যে মহিমের মেয়ের গানটির ("ভুলের ফুলে ভরেছি মোর সাজি") বিশেষ কিছু তাৎপর্য নেই। সুখী একটি শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত নাগরিক পরিবারের পটভূমিটিকে নাটকের প্রথম দৃশ্যেই যেভাবে তুলে ধরতে চেয়েছেন তুলসী লাহিড়ী ('দুঃখী' রহিমের সংসারের বিপরীতে), তার অনুষঙ্গে এই গানটি সংযোজিত। ভাব এবং ভাষায় গত শতকের চল্লিশের দশকের চলচ্চিত্রের বা 'আধুনিক' গানের সঙ্গে এই গানের বিশেষ ফারাক নেই।

ঐ দৃশ্যেই রহিমের একটি গান আছে ("ফালি চান্দের নাও ভাসি যায়") যা আবার ভাবে-রূপে ঐতিহ্যবাহী লোকসঙ্গীতের সঙ্গে একাত্ম। উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া গানের মধ্যে যেমন সর্বদাই একটা কারুণ্য ভরে থাকে, সেই ভাবটি এখানেও আছে। এই গানটিতে বেশ খানিকটা আধ্যাত্মিকতারও প্রকাশ ঘটেছে; যেমন : "কোন্ খেয়ালী বয়

রে খ্যাওয়া দূর দূরান্তরে,/নয়নে না চিনি তারে চিনি যে অন্তরে।" এই ধরনের গানের বাণী খানিকটা বাউলধর্মীও বটে।

ঐ একই দৃশ্যে রহিমের মুখে আরও একটি গানের কিছু অংশ শুনি আমরা ("বড় মিয়ার বাঁদির সাথে যদি হইল সাদী") যেটি একেবারেই লঘু—ভাব ও ভাষায়। উত্তর বাংলার চট্‌কা গানগুলি এই ছাঁদে রচিত হয়ে থাকে এখনও।

এই ধরনেরই আরেকটি গান পরের দৃশ্যেই আছে ("হাকিমুদ্দীর বুদ্ধিশুদ্ধি চুষি খাওয়ার কায়দাতে")—চট্‌কার ঢঙে তৈরি, তবে এই গানটি মূল কাহিনির সঙ্গে বিষয়গতভাবে সম্পর্কিত। হাকিমুদ্দীর ভাগচাষীই যদি তার সম্ভবন্ধে এ ধরনের তিক্ত টিপন্নী কেটে গান বাঁধে, তাহলে অন্যরা যে তার বিষয়ে কী ভাবে, বলে—সেটা সহজেই বোঝা যায়।

ঐ একই দৃশ্যে কালীনাচের দলের 'জাম্বুবান' সাজা লোকগায়কটির গলায় শোনা যায় যে গানটি ("শুনরে গ্রামের কথা"), তার মধ্যে দারিদ্র্য-দুঃখ-ব্যাধি-অশিক্ষা-শোষণ-ধর্মীয় প্রতারণা ইত্যাদি যে কীভাবে গ্রামের জীবনকে আর্ত করে রেখেছে, সেটির পরিচয় মেলে। এই একটি গানেই সমস্তটুকু আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত প্রমূর্ত হয়ে ওঠে। এদিক থেকে গানটি গুরুত্বপূর্ণ। এর রচনাভঙ্গীকে অনেক পরিমাণেই গম্ভীরা পালার গানের সঙ্গে সমতুল্য বলা যায়।

ঐ দৃশ্যেই রহিমের কণ্ঠে আরেকটি গান শোনা যায় ("স্বপ্নে দ্যাখোঁ মরি যায়া")। আপাত লঘুবাচনে রচিত হলেও, প্রকৃত প্রস্তাবে এটিও নাটকের ভাবরূপের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। মৃত্যুর পর কী হবে, এমন একটি কল্পনার মধ্যে হাকিমুদ্দীর প্রসঙ্গ এনে রহিম বলেছে, "উয়ার যদি মাফি হয় মোর কোনয় ডর নাই" এবং এই সূত্রে হাকিমের চরিত্রের কালো দিকটাও ইঙ্গিতে ব্যঞ্জিত হয়েছে এই গানে।

দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অঙ্কেরও দ্বিতীয় দৃশ্য দুটিতে গোবিন্দের মুখে দুটি গান শোনা যায়, যার মধ্যে প্রথমটিকে (না-খাওয়া শুটকাটা তার শুটকীক্ ডাকি কয়") 'জাম্বুবানের' গানের পরবর্তী পর্যায় বলেই ধার্য করা যায়। দুর্ভিক্ষের ভয়ঙ্কর ছবি এই মর্মান্তিক সত্যপ্রকাশ করা গানটির মধ্যে আতীব্র যন্ত্রণায় ফুটে উঠেছে। আর পরের গানটি, ("ভুল না রেখ মনে বাঁচবে যত কাল/সোনার দেশে ক্যান এল পঞ্চাশের আকাশ") প্রথমটিরই গম্ভীর-উত্তরসরণ। সমকালীন গণনাট্য আন্দোলনে বিশেষ করে গণনাট্যসঙ্ঘের গানে এই ধরনের ভাষা-চিত্রকল্প ইত্যাদি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

'ছেঁড়া তার' নাটকের বিভিন্ন গানের মধ্যে যেগুলি গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলি এই নাটকের উপজীব্য বিষয়ের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবেই জড়িত। চল্লিশের/পঞ্চাশের দশকে গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে-ঘুরে নবনাট্য-গণনাট্যের শিল্পীরা নাটকাভিনয় করতেন যখন, তখন বাংলা লোকনাটকের ছাঁদে গানের ব্যবহারও হামেশাই করতে হতো তাঁদের গ্রামীণ দর্শক সাধারণের মনের কাছে পৌঁছনোর জন্য। এ নাটকেও তাই গানের এমন প্রচুরায়ত প্রয়োগ হয়েছে।

৫.১৩ বিস্তৃত প্রশ্ন

১। গণনাট্য ও নবনাট্যের আদর্শগত পার্থক্য আলোচনা করে দেখান কিভাবে "ছেঁড়া তার" নাটকটি "নবান্নে"-র থেকে আলাদা মাত্রায় অন্বিত হয়েছে।

২। "ছেঁড়া তার" নাটকটি মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে কি? যুক্তিসহ আপনার বক্তব্য উপস্থাপিত করুন।

৩। "ছেঁড়া তার" নাটকের গঠনাঙ্গিকের অভিনবত্ব রয়েছে এর শেষ দৃশ্যটিতে। প্লট-নিরীক্ষার সূত্রে সেই অভিনবত্বটি কেমন সে বিষয়ে আলোচনা করুন।

৪। "ছেঁড়া তার" নাটকে ধর্ম, সমাজ ও ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব সর্বময় হয়ে থেকেছে মানবিক আবেগের বয়নে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করুন নাটকটির নামকরণ কেন ব্যঞ্জনাধর্মী হল। এই নামকরণটি যথার্থ হয়েছে কি?

৫। রহিমুদ্দী চরিত্রটির বিশ্লেষণ করে দেখান কেমনভাবে চরিত্রে নানান মাত্রার সহাবস্থানে এই মানুষটি নাটকের উজ্জ্বলতম উপস্থিতি হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে।

৬। ফুলজান কি শুধুই নাটকের অলংকরণ? নাকি কাহিনির জটিলতার সৃষ্টিতে তার চরিত্রের কোনো বিশেষ গুরুত্ব আছে?

৭। হাকিমুদ্দী কি টিপিক্যাল খলনায়ক, না এই নাটকের শ্রেণিশত্রুদের প্রতিনিধি? আপনার মতামত জানান।

৮। "ছেঁড়া তার" নাটকের ট্র্যাজেডির উৎস কি? যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করুন।

৫.১৪ অবিস্তৃত প্রশ্ন

১। নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন করুন।

২। নাটকের প্রথম দৃশ্যের তাৎপর্য বিচার করুন।

৩। মুখ্য না হয়েও কিভাবে ফুফা ও কানা ফকির নাটকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, সে বিষয়ে আলোচনা করুন।

৪। এই নাটকে যে বিশিষ্ট ভাষাভঙ্গী প্রয়োগ করা হয়েছে, সে বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

৫। এ নাটকে একাধিক গানের ব্যবহার আছে, এর যাথার্থ প্রয়োজনীয়তা নির্ণয় করুন।

৬। এ নাটকের শহুরে চরিত্র মহিম—এই চরিত্রটির উপস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করুন।

৫.১৫ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। "পাতাবাহারটি বাড়ির ভেতরে।"—কার সম্পর্কে, কে, এই উক্তি কার কাছে করেছে?

২। রহিমের দিলরুবার দাম কত ছিল? হাকিমুদ্দী সেটার দাম কত বলেছিল?

৩। জাম্বুবান নাম দিয়ে গান বেঁধেছিল কে? ঐ গানে বলা, "মুখটা ঠোসা প্যাট ড্যাংরা হাত পা ছিনা মড়া"—কথাগুলির মানে কী?

৪। "তাতে তোক্ ফারকৎ করি দেনো।"—এই কথার তাৎপর্য কী?

৫। "নিত্যকালের নয়ত রাহুর বল"—এই কথাটা কোন্ সূত্রে, কোথায় বলা হয়েছে?

৬। "আল্লা, অঁয় কি জুড়াইছে"—কথাটির অন্তর্লীন তাৎপর্য কী?